10 MINUTE SCHOOL

HSC 25
অনলাইন ব্যাচ
বাংলা • ইংরেজি • আইসিটি

বাংলা

২য় পত্র

আলোচ্য বিষয়

নির্মিতি - ১

অনলাইন ব্যাচ সম্পর্কিত যেকোনো জিজ্ঞাসায়,

কল করো 16910

সারাংশ ও সারমর্ম

সারাংশ

১. মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী। জগতের অন্যান্য প্রাণীর সহিত মানুষের পার্থক্যের কারণ- মানুষ বিবেক ও বুদ্ধির অধিকারী। এই বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞান নাই বলিয়া আর সকল প্রাণী মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ জগতের বুকে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়াছে, জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছে; পশুবল ও অর্থবল মানুষকে বড় বা মহৎ করিতে পারে না। মানুষ বড় হয় জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের বিকাশে। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশে জাতির জীবন উন্নত হয়। প্রকৃত মানুষই জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন আনয়নে সক্ষম।

[ঢা. বো, '১৯, '০৫; য. বো, '১৬, '১২; কু. বো. '১৬; চ. বো. '১৭, '১৪, '১২; সি. বো, '১৬; ম. বো. '২০]

সারাংশ: আল্লাহ মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞান, মনুষত্ব, চারিত্রিক গুণাবলি দ্বারা মানুষ অমরত্ব লাভ করে। অর্থ, দাম্ভিকতা মানুষকে হীন করে। জাতি তথা দেশের উন্নয়নে, সভ্যতার বিকাশে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মানবিক গুণাবলির বিকল্প নেই।

২. জাতি শুধু বাইরের ঐশ্বর্য-সম্ভার, দালান-কোঠার সংখ্যা বৃদ্ধি কিংবা সামরিক শক্তির অপরাজয়তায় বড় হয় না, বড় হয় অন্তরের শক্তিতে, নৈতিক চেতনায় আর জীবনপণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতায়। জীবনের মূল্যবোধ ছাড়া জাতীয় সত্তার ভিত কখনো শক্ত আর দৃঢ় হতে পারে না। মূল্যবোধ জীবনাশ্রয়ী হয়ে জাতির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়লেই তবে জাতি অর্জন করে মহত্ত্ব আর মহৎ কর্মের যোগ্যতা।

[রা. বো. '১৯; য. বো. "১৫; সি. বো. '১৪; ব. বো. '১৫]

সারাংশ: জাতির পরিচয় বাইরের ঐশ্বর্য, ও শক্তিতে নয়, অন্তরের শক্তিতে বিদ্যমান। জীবনভিত্তিক মূল্যবোধ থাকলেই জাতি মহত্ত্ব অর্জন করে।

৩. অনেকের ধারণা এই যে, মহৎ ব্যক্তি শুধু উচ্চ বংশেই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। নীচকুলে মহতের জন্ম হয় না। কিন্তু প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, মানুষের এই ধারণা ভ্রমাত্মক। পদ্মফুল ফুলের রাজা। রূপে-গন্ধে সে অতুলনীয়। কিন্তু এর জন্ম হয় পানের অযোগ্য পানিভরা এঁদো পুকুরে। পক্ষান্তরে বটবৃক্ষ বৃক্ষকূলের মধ্যে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন বটে, অথচ বহু বৃক্ষের ফল আমরা আস্বাদন করি, এত খ্যাতনামা যে বটবৃক্ষ তাহার ফল আমাদের অখাদ্য।

[চ. বো, '০৯] [পাবনা জেলা স্কুল]

সারাংশ: উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করলেই মহত্ত্বের দাবিদার হওয়া যায় না। প্রকাণ্ড এবং বৃক্ষসমাজে মর্যাদাসম্পন্ন বটগাছের ফল অখাদ্য। আর নীচকুলে জন্মগ্রহণ করেও সম্মানিত হওয়া যায় কর্মগুণে। কেননা অপেয় জলের মধ্যেই জন্মে সর্বজনপ্রিয় পদ্মফুল।

৪. অতীতকে ভুলে যাও, অতীতের দুশ্চিন্তার ভার অতীতকেই নিতে হবে। অতীতের কথা ভেবে ভেবে অনেক বোকাই মরেছে। আগামীকালের বোঝা, অতীতের বোঝার সঙ্গে মিলে আজকের বোঝা অনেক বড় হয়ে দাঁড়ায়। ভবিষ্যৎকে অতীতের মতো দৃঢ়ভাবে দূরে সরিয়ে দাও। আজই তো ভবিষ্যৎ, কাল বলে কিছু নেই। মানুষের মুক্তির দিন তো আজই। ভবিষ্যতের কথা যে ভাবতে বসে সে ভোগে শক্তিহীনতায়, দুশ্চিন্তায় ও স্নায়ুবিক দুর্বলতায়। অতএব, অতীতের ও ভবিষ্যতের দরজায় আগল লাগাও-আর শুরু কর দৈনিক জীবন নিয়ে বাঁচতে।

[সকল বোর্ড ২০১৮; ঢা. বো, '১১; রা. বো, '১৭, '০৫; চ. বো. '১৬; ব. বো.'১৬, '১৩] [বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বান্দরবান; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী]

সারাংশ: বর্তমানই জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। অতীত এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমান সময়কে নষ্ট করার মতো বোকামি আর হয় না। বর্তমানের কর্ম দিয়েই মানবজীবনের মুক্তি আসে। তাই অতীত আর ভবিষ্যৎকে নিয়ে চিন্তা না করে বর্তমান সময়কে কাজে খাটিয়ে জীবনকে সার্থক করে তুলতে হবে।

৫. খুব ছোট ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যেমন সূর্যকে দেখা যায়, তেমনি ছোট ছোট কাজের ভেতর দিয়েও কোন ব্যক্তির চরিত্র ফুটে ওঠে। বস্তুত মর্যাদাপূর্ণভাবে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন ছোট ছোট কাজেই চরিত্রের পরিচয়। অন্যের প্রতি আমাদের ব্যবহার কীরূপ তাই হচ্ছে আমাদের চরিত্রের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা। বড়, ছোট ও সমতুল্যের প্রতি সুশোভন ব্যবহার আনন্দের নিরবচ্ছিন্ন উৎস।

[রা. বো. ২০০০;য, বো, '০৭; কু. বো. '১৩, '১০, '০৫; সি. বো. '১০] [আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা; আগ্রবাদ সরকারী কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

সারাংশ: চরিত্র মানবজীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। আর চরিত্র প্রকাশ পায় তার ভালো কাজের মাধ্যমে, তা যত ছোটই হোক। ছোট বড় সবার সাথে ভালো ব্যবহারই চরিত্রের পরিচয় এবং আনন্দের উৎস।

৬. শ্রমকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ কর। কালিধূলার মাঝে, রৌদ্রবৃষ্টিতে কাজের ডাকে নেমে যাও। বাবু হয়ে ছায়ায় পাখার তলে থাকবার কোনো দরকার নেই। এ হচ্ছে মৃত্যুর আয়োজন। কাজের ভিতর কুবুদ্ধি, কুমতলব মানবচিত্তে বাসা বাঁধতে পারে না। কাজে শরীরে সামর্থ্য জন্মে, স্বাস্থ্য, শক্তি, আনন্দ, স্ফূর্তি সকলই লাভ হয়। পরিশ্রমের পর যে অবকাশ লাভ হয় তা পরম আনন্দের অবকাশ। তখন কৃত্রিম আয়োজন করে আনন্দ করবার কোন প্রয়োজন হয় না। শুধু চিন্তার দ্বারা জগতের হিত সাধন হয় না। শুধু চিন্তা করে মানুষ পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হয় না। মানবসমাজে মানুষের সঙ্গে কাজে, রাস্তায়, কারখানায়, মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে মানুষ নিজেকে পূর্ণ করে। চিন্তা ও পুস্তক মানব মনের পাঁপড়ি খুলে দেয় মাত্র, বাকি কাজ সাধিত হয় সংসারের কর্মক্ষেত্রে।

[ঢা. বো, '২০, ০৮, '০১; য. বো. '১৯, '১৭; কু. বো. '০৬; চ. বো. '০১; সি. বো. '১৭; ব. বো. '০৫; দি. বো. '১৬] [আল-আমিন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ, চাঁদপুর]

সারাংশ: আলস্য মানবজীবনের মৃত্যু ডেকে আনে আর কাজ জীবনকে সুন্দর করে তোলে। শুধু চিন্তা দিয়ে জগতের হিত সাধন হয় না বরং চিন্তার সঙ্গে যখন কর্ম যোগ হয় তখনই মানব কল্যাণ সাধিত হয়, সুন্দর হয় বিশ্বজগৎ।

৭. মানুষের মূল্য কোথায়? চরিত্রে, মনুষ্যত্বে, জ্ঞানে ও কর্মে। বস্তুত চরিত্রবলেই মানুষের জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তা বুঝতে হবে। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করবার আর কিছুই নেই। মানুষের শ্রদ্ধা যদি মানুষের প্রাপ্য হয়, মানুষ যদি মানুষকে শ্রদ্ধা করে, সে শুধু চরিত্রের জন্যই। অন্য কোন কারণে মানুষের মাথা মানুষের সামনে নত করার দরকার নেই। জগতে যেসকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের গৌরবের মূল এই চরিত্রশক্তি। তুমি চরিত্রবান লোক, এ কথার অর্থ এই নয় যে, তুমি লম্পট নও। তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ কর; তুমি পরদুঃখকাতর, ন্যায়বান এবং মানুষের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয় চরিত্র মানে এই।

[ঢা, বো, '১৫; রা. বো. '১৫; য. বো, '২০, '০১; কু. বো, '২০; সি. বো, '০৫; চ. বো. '১০; ব. বো. '১৪, '১২] [ইসলামি এডুকেশনাল ট্রাস্ট (আইইটি) সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়; সারদাসুন্দরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদপুর; সরকারি পিএন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী; নওগাঁ জিলা স্কুল, নওগাঁ; কুমিল্লা জিলা স্কুল, কুমিল্লা; ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্তঃবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; বরগুনা জিলা স্কুল, বরগুনা: গাইবান্ধা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গাইবান্ধা]

সারাংশ: মানুষের প্রকৃত মূল্য তার মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ও চরিত্রে। চরিত্রবলে মানুষ শ্রদ্ধা, ভক্তি অর্জন করতে পারে। পৃথিবীর সকল মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মূল চরিত্র। পরোপকারী, ন্যায়বান, সত্যবাদী, স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষই চরিত্রবান।

৮. আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের বা বিত্তের উপর নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি কেবল আগে যাবার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচণ্ডবেগে শুধু আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে; মানুষ যদি এ মূঢ়তাকে জয় না করতে পারে তবে মনুষ্যত্ব কথাটাই হয়ত লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখান থেকে আর হয়ত নামবার উপায় নেই। এবার ওঠবার সিঁড়িটা না খুঁজলেই নয়।

[রা. বো. '২০; য. বো, '০৮, '০৪; কু. বো, '১৭, '১২, '০৯, ২০০০; চ. বো. '২০, '১৯, '১৫, ০৭; সি. বো, '২০, '১৫, ০৪; ব. বো. '১৯; দি. বো. '১২] [কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কক্সবাজার; ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ভোলা]

সারাংশ: বর্তমানে পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের একমাত্র লক্ষ্য অর্থ আর বিত্ত। ফলে মানবিকতার হয়েছে স্খলন। এ মূঢ়তাকে জয় করতে না পারলে মনুষ্যত্বের বিসর্জন হবে। মানুষ এখন স্খলনের সর্বনিম্ন ধাপে, তাই এখন এ থেকে পরিত্রাণের পথ না খুঁজে কোনো উপায় নেই।

৯. কিসে হয় মর্যাদা? দামী কাপড়ে, গাড়ি-ঘোড়ায়, না ঠাকুরদাদার কালের উপাধিতে? না-মর্যাদা ঐ সকল জিনিসে নাই। আমি দেখতে চাই তোমার ভিতর, বাহির, তোমার অন্তর। আমি দেখতে চাই, তুমি চরিত্রবান কি না, তুমি কঠিন সত্যের উপাসক কি না? তোমার মাথা দিয়ে কুসুমের গন্ধ বেরোয়, তোমায় দেখলে দাসদাসী দৌড়ে আসে, প্রজারা তোমায় দেখে সন্ত্রস্ত হয়, তুমি মানুষের ঘাড়ে চড়ে হাওয়া খাও, মানুষকে দিয়ে জুতা খোলাও, তুমি দিনের আলোতে মানুষের টাকা আত্মসাৎ কর, বাপ-মা, শ্বশুর-শাশুড়ী তোমায় আদর করেন; আমি তোমায় (অবজ্ঞায়) বলবো- যাও।

[রা. বো. '১৬, '০৪; দি. বো. '১৯]

সারাংশ: মানুষের বেশভূষায় কিংবা বাপ-দাদার উপাধিতে মর্যাদা থাকে না, থাকে তার নিজের মহৎ গুণাবলির মধ্যে। চরিত্রবান হওয়ার মধ্যেই যথার্থ মর্যাদা নিহিত। মহৎ গুণ না থাকলে সমাজের কাছে তার কোনো মূল্য নেই।

১০. প্রকৃত জ্ঞানের স্পৃহা না থাকলে শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তখন পরীক্ষা পাস করাটাই বড় হয় এবং পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠায় জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকে। এই কারণে পরীক্ষায় পাস করা লোকের অভাব নেই আমাদের দেশে, কিন্তু অভাব আছে জ্ঞানের। যেখানেই পরীক্ষা পাসের মোহ তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের উৎকণ্ঠিত রাখে সেখানেই জ্ঞান নির্বাসিত জীবন যাপন করে। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে জগতের বুকে অক্ষয় অমর লাভ করতে হলে জ্ঞানের প্রতি তরুণ সমাজকে উন্মুখ করতে হবে। সহজ লাভ আপাতত সুখের হইলেও পরিণামে কল্যাণ বহন করে না। পরীক্ষা পাসের মোহ থেকে মুক্ত না হলে তরুণ সমাজের সামনে কখনোই জ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচিত হবে না।

[রা. বো, '০৯, '০৩; কু. বো. '০৪; চ. বো. '০৬; সি. বো. '০৮: ব. বো. '০৯, '০২]

সারাংশ: শিক্ষায় জ্ঞানের আগ্রহ না থাকলে সেই শিক্ষা ব্যর্থ হয়। কেবল পরীক্ষায় পাস নয়, জ্ঞানার্জনই শিক্ষার লক্ষ্য। জ্ঞানচর্চার মধ্যে স্বাধীন জাতির মর্যাদা নিহিত। কাজেই পরীক্ষা পাসের সহজ লাভ থেকে দৃষ্টি পরিবর্তন করে জ্ঞানচর্চায় মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

১১. কোনো সভ্য জাতিকে অসভ্য করার ইচ্ছা যদি তোমার থাকে তাহলে তাদের সব বই ধ্বংস কর এবং সকল পণ্ডিতকে হত্যা কর, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। লেখক, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতেরাই জাতির আত্মা। এই আত্মাকে যারা অবহেলা করে, তারা বাঁচে না। দেশকে বা জাতিকে উন্নত করতে চেষ্টা করলে, সাহিত্যের সাহায্যেই তা করতে হবে। মানব মঙ্গলের জন্য যত অনুষ্ঠান আছে, তার মধ্যে এটাই প্রধান ও সম্পূর্ণ। জাতির ভেতর সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি কর, আর কিছুর আবশ্যকতা নে

[ঢা. বো. '০৬, '৯৪; রা. বো. '১৪, '১১; য. বো. '০৯; চ. বো, '০৪]

সারাংশ: কোনো সভ্য জাতির উন্নয়নের প্রধান মাপকাঠি হলো, তাদের সাহিত্য অনুশীলন ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। মূলত বুদ্ধিজীবীরাই জাতির প্রাণ। তাই জাতির কল্যাণের জন্য উন্নত সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি করতে হবে। আর তার জন্য দরকার বুদ্ধিজীবীদের বাঁচিয়ে রাখা।

১২. বিদ্যা মানুষের মূল্যবান সম্পদ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু চরিত্র তদপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান। অতএব, কেবল বিদ্বান বলিয়াই কোন লোক সমাদর লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। চরিত্রহীন ব্যক্তি যদি নানা বিদ্যায় আপনার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াও থাকে, তথাপি তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। প্রবাদ আছে যে, কোন কোন বিষধর সর্পের মস্তকে মণি থাকে। মণি বহু মূল্যবান পদার্থ বটে। কিন্তু তাই বলিয়াই যেমন মণিলাভের নিমিত্তে বিষধর সর্পের সাহচর্য করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে, সেইরূপ বিদ্যা আদরণীয় বিষয় হইলেও বিদ্যালাভের নিমিত্ত বিদ্বান দুর্জনের নিকট, গমন বিধেয় নহে। কেননা দুর্জনের সাহচর্যে আপনার নিষ্কলুষ চরিত্রও কলুষিত হইতে পারে এবং মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ নষ্ট হইতে পারে।

[ঢা. বো. ০৩; রা. বো. ১২, '০৭; কু. বো. ২০০০; সি. বো. '০৯] [মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা; মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, মিরপুর, ঢাকা; ক্যামব্রিয়ান স্কুল ও কলেজ, ঢাকা; ইসলামি এডুকেশনাল ট্রাস্ট (আইইটি) সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়; নোয়াখালি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নোয়াখালী; ফেনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ফেনী; গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, কুমিল্লা; আলী আমজাদ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার; আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল, দিনাজপুর।]

সারাংশ: বিদ্যা অমূল্য বিষয়; কিন্তু চরিত্র তার চেয়েও মূল্যবান। চরিত্রহীন বিদ্বান ব্যক্তি মণিময় বিষধর সাপের মতো পরিত্যাজ্য। যে ব্যক্তি বিদ্বান ও চরিত্রবান তার সাহচর্য কল্যাণকর। কিন্তু চরিত্রহীন বিদ্বানের সান্নিধ্য বিপজ্জনক।

১৩. অভ্যাস ভয়ানক জিনিস। একে হঠাৎ স্বভাব থেকে তুলে ফেলা কঠিন। মানুষ হওয়ার সাধনাতেও তোমাকে ধীর ও সহিষ্ণু হতে হবে। সত্যবাদী হতে চাও? তাহলে ঠিক কর, সপ্তাহে অন্তত একদিন তুমি মিথ্যা বলবে না। দু'মাস ধরে এমনি করে নিজে সত্য কথা বলার অভ্যাস কর। তারপর এক শুভদিনে আর একবার প্রতিজ্ঞা কর, সপ্তাহে তুমি দু'দিন মিথ্যা কথা বলবে না। একবছর পর দেখবে সত্য কথা বলা তোমার কাছে অনেক সহজ হয়ে পড়ছে। সাধনা করতে করতে এমন একদিন আসবে, যখন ইচ্ছে করেও মিথ্যা বলতে পারবে না। নিজেকে মানুষ করবার চেষ্টায় পাপ ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামে তুমি হঠাৎ জয়ী হতে কখনো ইচ্ছা করো না। তাহলে সব পণ্ড হবে।

[চ. বো. '১৯; সি. বো, '১৯; ব. বো, '২০] [রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, রাজশাহী; কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ, কুমিল্লা; রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, উত্তরা, ঢাকা; চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম; চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বরিশাল: দিনাজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, দিনাজপুর; বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ]

সারাংশ: অভ্যাসের মাধ্যমেই মানুষের স্বভাব গড়ে ওঠে। মিথ্যা বলা একটি ভয়ানক বদভ্যাস। সত্যবাদী হতে হলে ধীরে ধীরে মিথ্যা বলার অভ্যাস দূর করতে হবে। নিয়মিত অনুশীলন ছাড়া সদভ্যাস অর্জন করা অসম্ভব। হঠাৎ করে অভ্যাস পরিবর্তন করা যায় না। নিজেকে মানুষ করতে হলে পাপ ও প্রবৃত্তির সাথে ধৈর্য ধরে সংগ্রাম করতে হবে।

১৪. তুমি জীবনকে সুন্দর করতে চাও ভাল কথা, কিন্তু সেজন্য তোমাকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হবে। মহৎ কিছু লাভ করতে হলে কঠোর সাধনার দরকার। তোমাকে অনেক দুঃখ সহ্য করতে হবে। এসব তুচ্ছ করে যদি তুমি লক্ষ্যের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হতে পার, তবে তোমার জীবন সুন্দর হবে। আরও আছে, তোমার ভেতরে এক "আমি আছে, সে বড় দুরন্ত। তার স্বভাব পশুর মত-বর্বর ও উচ্ছৃঙ্খল। সে কেবল ভোগবিলাস চায়, সে বড় লোভী।" এই 'আমি'কে জয় করতে হবে। তবেই তোমার জীবন সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠবে।

[ঢা. বো. '১৬, '০৭; য. বো. '১৪; সি. বো. '০৬; ব. বো. '১৭; দি. বো. '১৪, '১০] [মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]

সারাংশ: মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। মানুষের ভেতর পশুত্ব আছে। এ পশুত্বকে বলি দিতে হবে। 'আমিকে' জয় করতে পারলে মানুষ জীবনে সার্থকতা অর্জন করতে পারবে।

১৫. বাল্যকাল হইতেই আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক, তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোন মতে কাজ চলে মাত্র; কিন্তু মনের বিকাশ লাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে; কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলো অপাঠ্য পুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। ইহাতে আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গ্রহণ শক্তি, ধারণা শক্তি, চিন্তা শক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে ফল লাভ করে। [ঢা, বো. '১৪; কু. বো, '০২; দি. বো, '২০, '১৩, '১১]

সারাংশ: আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। শিক্ষার সাথে আনন্দ না থাকলে সে শিক্ষা হৃদয়ে স্থান লাভ করে না। এ ধরনের শিক্ষা দিয়ে কোন রকমে কাজ চললেও মানবিক বিকাশ সাধিত হয় না। তাই শিক্ষাকে আনন্দের অনুষঙ্গ করতে হবে।

১৬. মাতৃস্নেহের তুলনা নাই। কিন্তু অতি স্নেহ অনেক সময় অমঙ্গল আনয়ন করে। যে স্নেহের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃস্নেহের মমতার প্রাবল্যে মানুষ আপনাকে হারাইয়া আসল শক্তি মর্যাদা বুঝিতে পারে না। নিয়ত মাতৃস্নেহের অন্তরালে অবস্থান করিয়া আত্মশক্তির সন্ধান সে পায় না- দুর্বল, অসহায় পক্ষী শাবকের মত চিরদিন স্নেহাতিশয্যে আপনাকে সে একান্ত নির্ভরশীল মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীরু, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়। অন্ধ মাতৃস্নেহ সে কথা বুঝে না- দুর্বলের প্রতি সে স্থির লক্ষ্য, অসহায় সন্তানের প্রতি মমতার অন্ত নাই- অলসকে সে প্রাণপাত করিয়া সেবা করে, ভীরুতার দুর্দশা কল্পনা করিয়া বিপদের আক্রমণ হইতে ভীরুকে রক্ষা করিতে ব্যাপ্ত হয়।

[য. বো. '০৬; কু. বো. '০১; চ. বো. '১১; সি. বো. '০৭; ব. বো. '০৭] [রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী; নোয়াখালি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নোয়াখালী বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল; উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশাল; দি মিলেনিয়াম স্টারস স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর; আনজুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোনা]

সারাংশ: মাতৃস্নেহ- অতুলনীয়। তবে অতিরিক্ত স্নেহ সন্তানের অকল্যাণ বয়ে আনে। স্নেহের আধিক্যে সে আপন শক্তির মর্যাদা বুঝবার ক্ষমতা হারিয়ে পরনির্ভরশীল ও অসহায় হয়ে পড়ে। অন্ধ মাতৃস্নেহ তা বুঝে না বলে সন্তানের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয় এবং তাতে সন্তানের ক্ষতি হয়।

১৭. অপরের জন্য তুমি তোমার প্রাণ দাও- আমি বলতে চাইনে। অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর কর। অপরকে একটুখানি সুখ দাও; অপরের সঙ্গে একটুখানি মিন্ট কথা বল। পথের অসহায় মানুষটির দিকে একটা করুণ কটাক্ষ নিক্ষেপ কর, তাহলেই অনেক হবে। চরিত্রবান, মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষ নিজের চেয়ে পরের অভাবে বেশি অধীর হন। পরের দুঃখকে ঢেকে রাখতে গৌরব বোধ করেন।

[ঢা. বো. '০৯; রা. বো, '১৩; য. বো. '০২; চ. বো. '১৩; ব. বো. '০৬; দি. বো, '১৭]

সারাংশ: অন্যের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করা নিষ্প্রয়োজন বরং অন্যের প্রতি মধুর ব্যবহার ও তার ছোটখাটো ব্যথা দূর করেই তাকে সন্তুষ্ট করা যায়। পরোপকারী ব্যক্তি অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হন এবং সেই ব্যথাকে মোচন করে অধিক আনন্দ পান।

১৮. অনেকে বলেন, স্ত্রীলোকদের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন নাই। মেয়েরা চর্বচোষা রাঁধিতে পারে, বিবিধ প্রকার সেলাই করিতে পারে, দুই-চারখানা উপন্যাস পাঠ করিতে পারে, ইহাই যথেষ্ট, আর বেশি আবশ্যক নাই। কিন্তু ডাক্তার বলেন যে, আবশ্যক আছে, যেহেতু মাতার দোষ-গুণ লইয়া পুত্রগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়। এই জন্য দেখা যায় যে, আমাদের দেশে অনেক বালক শিক্ষকের বেত্রতাড়নায় কন্ঠস্থ বিদ্যার জোরে এফ.এ., বি.এ পাস হয় বটে; কিন্তু বালকের মনটা তাহার মাতার সহিত রান্না ঘরেই ঘুরিতে থাকে।

[সি. বো. '১১] [বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

সারাংশ: আমাদের দেশের লোকের ধারণা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই; তারা রান্না-বান্না এবং দু- চারখানা উপন্যাস পড়তে পারলেই যথেষ্ট। কিন্তু মায়ের দোষ- গুণ নিয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় বলে মায়ের মন-মানসিকতার উন্নতি না হলে সন্তানের মানসিকতারও উন্নতি হয় না। আর এ কারণেই মেয়েদের শিক্ষা অপরিহার্য।

১৯. সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া। স্বল্পপ্রাণ, স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়, অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃত বুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অহংকার। ব্যক্তিগত অহংকার, পারিবারিক অহংকার, জাতিগত অহংকার- এসবের নিশান উড়ানোই এদের কাজ।

[নেত্রকোনা সরকারি মহিলা কলেজ; জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট রংপুর জিলা স্কুল]

সারাংশ: মানবিক বিকাশের সুযোগ দিয়ে মানুষকে বড় করে তোলাই সমাজের কাজ। অথচ সমাজের কিছু মানুষ প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়ে অহংকারী, নিষ্ঠুর ও বিকৃত মানসিকতার হয়ে ওঠে। এরা অন্যের সার্থকতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং সমাজে অশান্তির সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় প্রেম-ভালোবাসা-সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষিত করে এই বিপথগামী মানুষদের জীবন সার্থক ও সুন্দর করে গড়ে তোলাও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

২০. অভাব আছে বলিয়া জগৎ বৈচিত্র্যময় হইয়াছে। অভাব না থাকিলে জীব সৃষ্টি বৃথা হইত। অভাব আছে বলিয়া অভাব পূরণের এত উদ্যম, এত উদ্যোগ। সংসার অভাবক্ষেত্র বলিয়া কর্মক্ষেত্র। অভাব না থাকিলে সকলকেই স্থাণু, স্থবির হইতে হইত, মনুষ্যজীবন বিড়ম্বনাময় হইত। মহাজ্ঞানীরা জগৎ হইতে দুঃখ দূর করিবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু জগতে দুঃখ আছে বলিয়া আমরা সেবার সুবিধা পাইয়াছি। সেবা মানবজীবনের পরম ধর্ম।

[ফয়জুর রহমান আইডিয়াল ইনস্টিটিউট, ঢাকা]

সারাংশ: অভাব জীবনের সাথে জড়িত। অভাব দূর করার চেষ্টা থেকে জীবনের বিকাশ ঘটে। কাজেই অভাব না থাকলে জীবনের গতিময়তা থাকত না, জীবন হতো জড় পদার্থ। জ্ঞানীরা জগৎ থেকে দুঃখ দূর করার জন্য মানুষের সেবা করেন এবং একেই তারা মনে করেন জীবনের মহান ধর্ম।

২১. তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফোটে, দক্ষিণা বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর, আবার যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরথরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক বাপু! যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালা ঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক, চিল ডিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা মাজা কালো দুলালী ধরনের শরীরখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত বর্ষার কেহ নও।

[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা সেনানিবাস; ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, টাঙ্গাইল; বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল; কুমিলা মডার্ন হাই স্কুল।]

সারাংশ: সুখ-দুঃখ নিয়েই পৃথিবী। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ পৃথিবীতে এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা মানুষের সুসময়ে কাছে ভিড়ে, কিন্তু দুঃসময়ে সটকে পড়ে। এরা মানবতার দোস্ত নয়, বরং দুশমন। আমাদের উচিত শুধু সুদিনে নয়, দুর্দিনেও একে অপরের পাশে থাকা, পরস্পরকে ভালোবাসা।

২২. মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দন্ধ করিয়া একবার বাহির হইয়া আসে! কালের শঙ্খরন্ধ্রে এই নীরব সহস্র বৎসর যদি এককালে ফুৎকার দিয়া উঠে, তবে সে বন্ধনমুক্ত উচ্ছ্বলিত শব্দের স্রোতে দেশ-বিদেশ ভাসিয়া যায়। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন তুষারের মধ্যে যেমন কত শত বন্যা বাঁধা পড়িয়া আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব- হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

[ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও, ঢাকা; ইবনে তাইমিয়া স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা।]

সারাংশ: লাইব্রেরি নীরব সমুদ্রের মতো কাল থেকে কালান্তরের অগাধ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অন্যতম বাহক। এটি মানুষের হাজার হাজার বছরের সাধনালব্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডার। জ্ঞানচর্চা করে হীনতা, দীনতা, মলিনতা ও কুসংস্কারের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করে নিজেকে আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হতে সাহায্য করে লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত করা বিভিন্ন ধরনের বই। তাই লাইব্রেরি মানবজাতির জন্য অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে।

২৩. আমরা ছেলেকে স্কুল কলেজে পাঠিয়ে ভাবি যে, শিক্ষা দেওয়ার সমস্ত কর্তব্য পালন করলাম। বছরের পর বছর পাস করে গেলেই অভিভাবকরা যথেষ্ট তারিফ করেন। কিন্তু তলিয়ে দেখেন না যে, কেবল পাস করলেই বিদ্যা অর্জন হয় না। বাস্তবিকপক্ষে ছাত্রের বা সন্তানের মনে জ্ঞানানুরাগ বা জ্ঞানের প্রতি আনন্দজনক শ্রদ্ধার উদ্রেক হচ্ছে কিনা, তাই দেখবার বিষয়। জ্ঞান চর্চার মধ্যে যে এক পরম রস ও আত্মপ্রসাদ আছে, তার স্বাদ কোন কোন শিক্ষার্থী এক বিন্দুও পায় না। **[কু. বো. '০৩] [ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম]**

সারাংশ: বছরান্তে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই বিদ্যার্জন হয় না। জ্ঞানের প্রতি এক আনন্দময় ও শ্রদ্ধামিশ্রিত অনুরাগের জন্মদানই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে এক পরম রস ও আত্মপ্রসাদ।

২৪. কথায় কথায় মিথ্যাচরণ, বাক্যের মূল্যকে অশ্রদ্ধা করা- এসব সত্যনিষ্ঠ স্বাধীন জাতির লক্ষণ নয়। স্বাধীন হওয়ার জন্য যেমন সাধনার প্রয়োজন, তেমনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতার। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধহীন জাতি যতই চেষ্টা করুক তাদের আবেদন নিবেদন আল্লাহর কাছে পৌছাবে না। তাদের স্বাধীনতার দ্বার থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হবে। যে জাতির অধিকাংশ ব্যক্তি মিথ্যাচারী, সেখানে দু'একজন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির বহুবিড়ম্বনা সহ্য করতে হবে। কিন্তু মানবকল্যাণের জন্য, সত্যের জন্য যে বিড়ম্বনা ও নিগ্রহ তাসহ্য করতেই হবে।

[হলি ক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা]

সারাংশ: স্বাধীন হওয়ার জন্য সাধনা প্রয়োজন। ঠিক তেমনই স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠা আবশ্যক। মিথ্যা জীবনে ধ্বংস ও পরাধীনতা ডেকে আনে। কোনো জাতির সামান্য সংখ্যক লোক সত্যবাদী হলেও তারা বিড়ম্বনা ও নিগ্রহের শিকার হয়, তথাপি দেশ ও জাতির স্বার্থে তাঁরা সত্য ত্যাগ করেন না।

সারমর্ম

১. আসিতেছে শুভ দিন
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ।
হাতুড়ি, শাবল, গাঁইতি চালায়ে ভাঙ্গিল যারা পাহাড়,
পাহাড় কাটা সে পথের দুপাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে সেবিতে যাহারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা গাহি তাদের গান
তাদের ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।
তুমি শুয়ে রবে তেতলার' পরে আমরা রহিব নীচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজি মিছে।
সিক্ত যাদের সারা দেহমন মাটির মমতা রসে
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে।
তারি 'পদরজ অঞ্জলি করি মাথায় লইব তুলি,
সকলের সাথে পথে চলি যার পায়ে লাগিয়াছে ধূলি।

[রা. বো. '১৫; কু. '২০; ব. বো. '১৭] রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, রাজশাহী; রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী; মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর; কুমিল্লা জিলা স্কুল, কুমিল্লা; বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বান্দরবান; উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশাল]

সারমর্ম: নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এবং জীবনে কল্যাণ, সুখশান্তি, সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে মজুর, কুলি, মুটে প্রতিনিয়ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এ বিশ্ব সভ্যতার বিকাশে তাদের অবদান অতুলনীয়, অবিস্মরণীয়। তারা নররূপী দেবতা। তবুও সমাজে তারা ঘৃণিত, অবহেলিত। তাদের ঋণের কথা স্বার্থপর মানুষ ভুলে যায়। সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন উঁচু তলার মানুষগুলো ঋণশোধ করার মানসে মুটে, মজুর ও কুলিকে সম্মান করবে, তাদের ত্যাগের কথা স্বীকার করবে।

২. আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি পচা অতীত,
গিরি-গুহা ছাড়ি খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত।
সৃজিব জগৎ বিচিত্রতর, বীর্যবান,
তাজা জীবন্ত সে নব সৃষ্টি শ্রম-মহান,
চলমান-বেগে প্রাণ-উছল
রে নবযুগের স্রষ্টাদল জোর কদমে চল্ রে চল্। **[কু. বো. '১৯, '১৫]**

সারমর্ম: তারুণ্যশক্তি নবযুগের স্রষ্টা। তারা নিষ্ফলা অতীতকে পেছনে ফেলে সম্ভাবনাময় বর্তমানকে সফল করে তুলতে চায়। তাই সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে ছেড়ে উদার ও মহৎ প্রাণ নিয়ে বীর্যবান বিচিত্রতর সৃজনশীল জগৎ গড়ে তুলতে চায়। শ্রম ও মেধার বিনিময়ে তাজা ও জীবন্ত নব নব সৃষ্টির ধারাকে চলমান রেখে তারা নির্মাণ করতে চায় গতিশীল ও সমৃদ্ধ বিশ্ব।

৩. পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ,
সুখ সুখ করি কেঁদ না আর,
যতই কাঁদিবে যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয় ভার।
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। **[সি. বো, '১৬; ঢা. বো. '১৪] [নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]**

সারমর্ম: পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করার মতো সুখ আর নেই। স্বার্থপরতা জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়, এতে সুখ লাভ ও আনন্দ পাওয়া যায় না। প্রীতি, ভালোবাসা, সেবাব্রত এবং কল্যাণ সাধনের জন্য মানুষের জন্ম। তাই প্রত্যেকেরই অপরের কল্যাণ বা মঙ্গল কামনা করা উচিত।

৪. একদা ছিল না জুতা চরণ যুগলে
দহিল হৃদয়মন সেই ক্ষোভানলে।
ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুঃখাকুল মনে
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে।
সেথা দেখি একজন পদ নাহি তার
অমনি জুতার খেদ ঘুচিল আমার।
পরের দুঃখ করিলে চিন্তন,
আপন মনের দুঃখ থাকে কতক্ষণ?
[রা, বো. '২০; য. বো. '১৪] [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]

সারমর্ম: সাধুর পায়ে জুতা ছিল না বলে তার মনে খুব দুঃখ। কিন্তু প্রার্থনালয়ের সামনে পা-হারা ব্যক্তিকে দেখে তার সে খেদ দূর হলো। দুঃখ অন্তরে উপলব্ধি করার অনুভূতি জাগ্রত হলো তার। পরের দুঃখকে নিজের হৃদয়ে একবার উপলব্ধি করলে নিজের সামান্য দুঃখ-কষ্টের কথা আমাদের আর মনে থাকে না।

৫. হে দারিদ্রদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান!
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিষ্টের সম্মান
কণ্টক-মুকুট শোভা।- দিয়াছ তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি; বাণী ক্ষুরধার;
বীণা মোর শাপে তব হ'ল তরবার!
দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্গেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ-রস প্রাণ!
শীর্ণ করপুট ভরি সুন্দরের দান
যতবার নিতে যাই- হে বুভুক্ষু, তুমি
অগ্রে আসি, কর পান! শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক।

সারমর্ম: দারিদ্র্য যন্ত্রণাদায়ক, কিন্তু দুঃখের দহনেই মানুষ হয় নিকষিত খাঁটি। অতি দারিদ্রদ্র্য মানুষের কল্পনাকে শুকিয়ে ফেলে তার কল্পলোককে পরিণত করে ঊষর মরুভূমিতে। কিন্তু কবির কাব্যে সত্য প্রকাশের যে বলিষ্ঠ অসংকোচ ভাব দেখা যায়, তা দারিদ্র্যের দুঃসহ দাহনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। তাই কবি দারিদ্র্যকে অভিশাপ মনে করছেন না।

৬. এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ- পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাবো-তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি-
নব জাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

[ঢা. বো. '০২; কু. বো, '০১; য. বো, '০৪; চ. বো, '১০, '০৪; ব. বো. '০৮। সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, টঙ্গী, গাজীপুর; সারদাসুন্দরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদপুর; নোয়াখালি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নোয়াখালী।]

সারমর্ম: পৃথিবীর মানুষকে তাদের জীবনের ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে সরে যেতে হবে। স্থান ছেড়ে দিতে হবে নবাগত শিশুদের জন্যে। যাবার আগে তাদের পুরাতন পৃথিবীর জঞ্জাল পরিষ্কার। করে নবাগত শিশুদের বাসযোগ্য করে যেতে হবে।

৭. দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ
কোন ব্যথা নাহি পায়, তার দণ্ড দান
প্রবলের অত্যাচার। যে দন্ড বেদনা
পুত্রেরে না পার দিতে, সে কারেও দিও না,
যে তোমার পুত্র নহে, তারও পিতা আছে,
মহা অপরাধী হবে তুমি তার কাছে।

[ঢা. বো. '৯৯; রা. বো, '১৪; য. বো, '০৮; কু. বো, '১৪, '১১, ০৪; চ. ঘো. '১৯; সি. বো. '১৯; ব. বো. '১২]

সারমর্ম: অপরাধপ্রবণতা মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি নয়। কাজেই কোনো অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার আগে বিচারককে আন্তরিক ও সহমর্মী হওয়া উচিত'। যে বিচারক দণ্ড দিতে গিয়ে অপরাধীর প্রতি সহানুভূতিশীল হন তাঁর বিচারই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচার।

৮. কোথায় স্বর্গ? কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর?
মানুষেরই মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর।
রিপুর তাড়নে যখনি মোদের বিবেক পায় গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়েঘরে।

[সকল বোর্ড ২০১৮; ঢা. বো, '২০; য. বো, '১৫, '০৬; কু. বো, '০৮; চ. বো. '১৭, '১২, '০৭, সি. বো. '০৭; ব. বো, '০৩] [হলি ক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা: মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, মিরপুর, ঢাকা; কুমিলা মডার্ন হাই স্কুল, কুমিল্লা; সেন্ট প্লাসিডস্ হাই স্কুল; দি মিলেনিয়াম স্টারস স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর; বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।]

সারমর্ম: স্বর্গ ও নরকের অবস্থান দূরে নয় বরং খুব কাছেই। মানুষের মধ্যেই স্বর্গ-নরক রয়েছে। রিপুর তাড়নায় মানুষ বিবেকহীন আচরণে নরকের যন্ত্রণা ভোগ করে। অন্যদিকে প্রীতিমুগ্ধ এবং কল্যাণময় আচরণ দারিদ্র্যের কুঁড়েঘরে নিয়ে আসে স্বর্গীয় সুখ।

৯. বহুদিন ধরে বহুক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহুদেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু,
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া;
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু

[ঢা. বো, '১০, '০৭, '০৫; রা. বো. '১১; সি. বো. '১২, '০৯; ব. বো. '০৭; দি. বো. '১০]

সারমর্ম: সৌন্দর্যলিপ্সু মানুষ বহু ব্যয় করে দূর দেশে সৌন্দর্য অবলোকনের জন্য যায়। অথচ তার 'আঙিনার সৌন্দর্য সে উপভোগ করে না। এ সৌন্দর্যকে অবহেলা করে দূরদেশে যাওয়া সত্যি অনর্থক।

১০. "বসুমতি, কেন তুমি এতই কৃপণা?
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্যকণা।
দিতে যদি হয় দে মা প্রসন্ন সহাস-
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস?
বিনা চাষে শস্য দিলে কি তাহাতে ক্ষতি?"
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহে বসুমতি-
"আমার গৌরব তাতে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাতে একেবারে ছাড়ে।"

[ঢা. বো. '১১; রা. বো, ১৩; য. বো. '১৯, '০৫; কু. বো. '১২, ০৩; চ. বো, '১৩, '১১, '০৫, '০২; সি. বো. '১৭, '১৫, '১৩; ব. বো. '১১; দি. বো. ১৯, '১৬/ [ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম; ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ; ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও, ঢাকা; ক্যামব্রিয়ান স্কুল ও কলেজ, ঢাকা; বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ; সরকারি পিএন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী; পাবনা জিলা স্কুল; নাটোর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়; ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম; চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়; বরিশাল জিলা স্কুল।]

সারমর্ম: শ্রমলব্ধ সম্পদে গৌরব আছে, আছে আনন্দ। আর শ্রমহীন প্রাপ্তিতে থাকে দুর্বলতা, থাকে অবসাদ। তাই সকলেরই উচিত পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করা। কারণ, পরের দান গ্রহণে কোন আত্মতৃপ্তি নেই, শ্রমেই সত্যিকারের গৌরব।

১১. হায় হায় জনমিয়া যদি না ফুটালে।
একটি কুসুম কলি নয়ন কিরণে
একটি জীবন ব্যথা যদি না জুড়ালে
বুক ভরা প্রেম ঢেলে বিফল জীবনে,
আপনা রাখিলে ব্যর্থ জীবন সাধনা
জনম বিশ্বের তরে পরার্থে কামনা।

[য. বো. '১৩; চ. বো, '০৯; ব. বো..'০৫] [সিটি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

সারমর্ম: মানুষ যদি তার কাজের মাধ্যমে অন্যের উপকার করতে বা অন্যের মনের ব্যথা দূর করতে না পারে, তা হলে তার জন্মই বৃথা। কারণ পরের উপকারে আত্মোৎসর্গ করার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নিহিত।

১২. ছোট ছোট বালু কণা, বিন্দু বিন্দু জল,
গড়ে তোলে মহাদেশ, সাগর অতল,
মুহূর্ত নিমেষ কাল তুচ্ছ পরিমাণ,
রচে যুগ যুগান্তর অনন্ত মহান।
প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি ক্ষুদ্র অপরাধ।
ক্রমে টানে পাপ পথে ঘটায় প্রমাদ।
প্রতি করুণার দান স্নেহপূর্ণ বাণী
এ ধরায় স্বর্গসুখ নিত্য দেয় আনি।

[ঢা. বো. '০৪; দি. বো, '১২. '০৯] [সিটি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

সারমর্ম: কোনো ক্ষুদ্র বস্তুই তুচ্ছ নয়। সহস্র ক্ষুদ্রের সমন্বয়েই বৃহতের সৃষ্টি। ত্রুটি কিংবা অপরাধ ক্ষুদ্র হলেও ক্রমে তা পাপের দিকে টেনে নিয়ে ভয়ঙ্কর প্রমাদ ঘটায়। অন্যদিকে করুণা ও স্নেহের ক্ষুদ্র বাণী এ মাটির পৃথিবীতে স্বর্গের সুখ এনে দিতে পারে।

১৩. দৈন্য যদি আসে আসুক, লজ্জা কিবা তাহে
মাথা উঁচু রাখিস।
সুখের সাথী মুখের পানে, যদি না চাহে
ধৈর্য ধরে থাকিস।
রুদ্ররূপে তীব্র দুঃখ যদি আসে নেমে
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস।
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে
ঊর্ধ্বে দু'হাত বাড়াস।

[ঢা. বো. '১৬, '১৩; রা. বো. '১৭, '০৪; য. বো, '১৭, '১০, '০৩, '০১; চ. বো. '১৬; সি. বো. '২০; ব. বো, '২০, '১৯; দি. বো, '২০, '১১; ম. বো. '২০] [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, উত্তরা, ঢাকা; মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা; ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, টাঙ্গাইল; ইসলামি এডুকেশনাল ট্রাস্ট (আইইটি) সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়; বগুড়া জিলা স্কুল, বগুড়া; ফেনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ফেনী; গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, কুমিল্লা; চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম; চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্তঃবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কক্সবাজার; বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বরিশাল; পিরোজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পিরোজপুর; আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল, দিনাজপুর; দিনাজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, দিনাজপুর; পুলিশ লাইনস স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর; গাইবান্ধা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গাইবান্ধা; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর; আনজুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোনা।]

সারমর্ম: জীবনে দুঃখকষ্ট, ব্যথাবেদনা, জরামৃত্যু আছে। দুঃখের দিনে কেউ সঙ্গী হতে চায় না, তা বলে হতাশ হলে চলবে না। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সকল বাধাকে জয় করে সম্মুখে এগিয়ে যেতে হবে।

১৪. নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো,
যুগ জনমের বন্ধু আমার আঁধার ঘরের আলো।
সবাই মোরে ছাড়তে পারে বন্ধু যারা আছে,
নিন্দুক সে ছায়ার মত থাকবে পাছে পাছে।
বিশ্বজনে নিঃস্ব করে, পবিত্রতা আনে,
সাধকজনে নিস্তারিতে তার মত কে জানে?
বিনামূল্যে ময়লা ধুয়ে করে পরিষ্কার,
বিশ্বমাঝে এমন দয়াল মিলবে কোথা আর?
নিন্দুক সে বেঁচে থাকুক বিশ্বহিতের তরে,
আমার আশা পূর্ণ হবে তাহার কৃপা ভরে।

[ঢা. বো. '০৯; রা. বো, '১৬, '০৬; য. বো. '২০; চ. বো, '২০; ব. বো. '০৪; সি. বো. '১০; দি. বো, '১৭] [বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাই]

সারমর্ম: নিন্দুক সর্বদা মানুষের নিন্দা করে ও ভুল-ত্রুটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। যার ফলে মানুষের ভুল-ত্রুটি সংশোধন হয়। নিন্দুকের নিন্দাবাণী মানুষকে নিজের সম্পর্কে সচেতন করে এবং ভালো মানুষ রূপে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। তাই নিন্দুক মানুষের পরম বন্ধু।

১৫. সার্থক জনম আমার জন্মেছি এ দেশে,
সার্থক জনম মা গো তোমায় ভালবেসে।
জানি না তোর ধনরতন আছে কি-না রাণীর মতন
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।
কোন বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন গগনে উঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
ঐ আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।

[সকল বোর্ড '৯৮; ঢা. বো, '১৯. '০৩; রা. বো, '১৯, '১২; কু. বো, '০৬, ২০০০; সি. বো. '১৪; ব. বো, '১৬, '১৪; দি. বো. '১৫, '১৪]

সারমর্ম: জন্মভূমিকে ভালোবাসলে জীবন সার্থক হয়। জন্মভূমির চিন্তা মানুষকে মহত্ত্ব ও গৌরব দান করে। জন্মভূমির আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, ফল, ফুল সত্যই প্রিয়। জন্মভূমির মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারলে জীবন ধন্য ও সার্থক হয়।

১৬. আমার একার সুখ, সুখ নহে ভাই,
সকলের সুখ সখা, সুখ শুধু তাই।
আমার একার আলো সে যে অন্ধকার
যদি না সবারে অংশ দিতে আমি পাই।
সকলের সাথে বন্ধু সকলের সাথে,
যাইব কাহারে বলো, ফেলিয়া পশ্চাতে?
ভাইটি আমার সেতো ভাইটি আমার।
নিয়ে যদি নাহি পারি হতে অগ্রসর,
সে আমার দুর্বলতা, শক্তি সে তো নয়।
সবই আপন হেথা, কে আমার পর?
হৃদয়ের যোগ সে কি কভু ছিন্ন হয়?
এক সাথে বাঁচি আর এক সাথে মরি,
এসো বন্ধু, এ জীবন মধুময় করি। **[ঢা. বো. ২০০০; য. বো. '০৯; চ. বো. '০৩; কু. বো. '১০]**

সারমর্ম: নিজের সুখের মধ্যে প্রকৃত সুখ নেই, সকলের মনে সুখের সঞ্চার করতে পারলেই পরিপূর্ণ সুখ পাওয়া যায়। সকল মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় সকলের কল্যাণ সাধনই মানুষের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তাই একত্রে প্রীতির বাঁধনে সকলের মঙ্গল সাধনায় জীবন যাপনের মধ্যেই সার্থকতা ফুটে ওঠে।

১৭. পরের মুখে শেখা বুলি পাখির মত কেন বলিস?
পরের ভঙ্গি নকল করে নটের মত কেন চলিস?
তোর নিজস্ব সর্বাঙ্গে তোরে দিলেন ধাতা আপন হাতে
মুছে সেটুক বাজে হলি, গৌরব কিছু, বাড়লো তাতে?
আপনারে যে ভেঙ্গেচুরে গড়তে চায় পরের ধাঁচে
অলীক, ফাঁকি, মেকি সে জন নামটা তাঁর কদিন বাঁচে?
পরের চুরি ছেড়ে দিয়ে আপন মাঝে ডুবে যারে
খাঁটি ধন যা সেথায় পাবি, আর কোথাও পাবি না রে।

[ঢা. বো. '১৭, '০৬, য. বো. '১৬; কু. বো. '১৭; চ. বো. '১৪; সি. বো. '০২] [আল-আমিন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ, চাঁদপুর]

সারমর্ম: নিজস্বতাই মানুষের যথার্থ পরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি। পর ভাষা ও ভূষণ অনুসরণ করে মানুষ 'নকল' মানুষ হয়ে উঠতে পারে। এতে মানুষের কোনো মর্যাদা নেই বরং নিজেরই অমর্যাদা ঘটে। আপন মূল্যবোধ ও সত্তাকে ধারণ করেই মানুষ সত্যিকার প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা লাভ করতে পারে। বস্তুত অনুকরণ সর্বদাই নিন্দনীয়।

১৮. "শৈশবে সদুপদেশ যাহার না রোচে
জীবনে তাহার কভু মূর্খতা না ঘোচে;
চৈত্র মাসে চাষ দিয়া না বোনে বৈশাখে,
কবে সেই হৈমন্তিক ধান্য পেয়ে থাকে?
সময় ছাড়িয়া দিয়া করে পণ্ডশ্রম,
ফল চাহে সেও অতি নির্বোধ অধম;
খেয়াতরী চলে গেলে বসে থাকে তীরে,
কিসে পার হবে তরী না আসিলে ফিরে?"

[ঢা. বো. '০১; রা. বো. '০২; চ. বো, '১৫, '০৬; ব. বো, '১৫, '১৩, '০৬] [নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ; বনফুল আদিবাসী গ্রীনহার্ট কলেজ, ঢাকা।]

সারমর্ম: সময়ের চাকা অবিরত চলতেই থাকে, কারও জন্যই অপেক্ষা করে না। তাই যে সময়ের কাজ তা সে সময়েই সম্পন্ন করতে হয়। সময় চলে গেলে সে কাজ কোনো সুফল বয়ে আনতে পারে না।

১৯. ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয়দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

[মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর; নবাব ফয়জুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা; আলী আমজাদ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার; ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ভোলা]

সারমর্ম: নবীনের কর্মচাঞ্চল্য ও দুরন্ত গতিশীলতা পৃথিবীকে নতুন উদ্যমে সাজিয়ে তোলে। পুরনোকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাওয়া ব্যক্তিরা নতুনত্ব ও পরিবর্তনকে ভয় পায়। দীপ্তিময় তারুণ্যশক্তি সেসব জরাগ্রস্ত পুরনোকে ঘা মেরে নব উদ্যমে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়।

২০. ধন্য আশা কুহকিনী! তোমার মায়ায়
অসার সংসার চক্র ঘোরে নিরবধি;
দাঁড়াইতে স্থিরভাবে, চলিত না, হায়
মন্ত্রবলে তুমি চক্র না ঘুরাতে যদি।
ভবিষ্যৎ অন্ধ, মূঢ় মানব সকল
ঘুরিতেছে কর্মক্ষেত্রে বর্তুল-আকার;
তব ইন্দ্রজালে মুগ্ধ, পেয়ে তব বল
যুঝিছে জীবন যুদ্ধে হায় অনিবার।
নাচায় পুতুল দক্ষ বাজিকরে,
নাচাও তেমনি তুমি অর্বাচীন নরে। **[রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল]**

সারমর্ম: জগৎ-সংসারে আশাই মানুষের বেঁচে থাকার প্রাণশক্তি। সংসারের ঘূর্ণিপাকে আশার ছলনায় মানবজীবন আবর্তিত হয়। আশাহীন জীবন স্থবির ও নিশ্চল হয়ে পড়ে। প্রতিকূলতা ও সংকট কাটিয়ে মঙ্গলময় জীবনের দিকে মূলত আশায় বুক বেঁধেই মানুষ অগ্রসর হতে পারে।

২১. এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাবো- তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি-
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। **[ঢা. বো. '০২; দি. বো, '১০] [সিলেট ক্যাডেট কলেজ]**

সারমর্ম: পৃথিবীর মানুষকে তাদের জীবনের ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে সরে যেতে হবে। স্থান ছেড়ে দিতে হবে নবাগত শিশুদের জন্য। যাওয়ার আগে তাদের পুরনো পৃথিবীর জঞ্জাল পরিষ্কার করে নবাগত শিশুদের বাসযোগ্য করে যেতে হবে।

২২. তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙল,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো।
রিকয়েললেস রাইফেল
আর মেশিনগান খই ফোটাল যত্রতত্র।
তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।
তুমি আসবে বলে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার
ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করল একটা কুকুর।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিল পিতা-মাতার লাশের উপর।

[ইবনে তাইমিয়া স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা; চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল; রংপুর জিলা স্কুল]

সারমর্ম: মানবজীবনের সবচেয়ে মূল্যবান ও কাঙ্ক্ষিত বিষয় হলো স্বাধীনতা। এটি অর্জনের জন্য আত্মোৎসর্গ ও ত্যাগের কোনো অন্ত থাকে না। ধ্বংস, মৃত্যু, ক্ষয়, আর্তনাদ বা যাতনা কোনো কিছুই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রশমিত করতে পারে না। স্বাধীনতা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা এতই তীব্র দেশের প্রতিটি মানুষকে এটির জন্য তার সবকিছু বিসর্জন দিতে হয়।

২৩. নিখিলের এত শোভা, এত রূপ, এত হাসি-গান,
ছাড়িয়া মরিতে মোর কভু নাহি চাহে মন-প্রাণ
এ বিশ্বের সব আমি প্রাণ দিয়ে বাসিয়াছি ভালো-
আকাশ বাতাস জল, রবি-শশী, তারকার আলো।
সকলেরই সাথে মোর হয়ে গেছে বহু জানা-শোনা,
কত কি-যে মাখামাখি, কত কি-যে মায়া-মন্ত্র বোনা।
বাতাস আমারে ঘিরে খেলা করে মোর চারিপাশ,
অনন্তের কত কথা কহে নিতি নীলিমা আকাশ।
চাঁদের মধুর হাসি, বিশ্বমুখে পুলক চুম্বন,
মিটিমিটি চেয়ে থাকা তারকার করুণ নয়ন,
বসন্ত নিদাঘ-শোভা, বিকশিত কুসুমের হাসি,
দিকে দিকে শুধু গান, শুধু প্রেম-ভালোবাসাবাসি।

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট।]

সারমর্ম: পৃথিবীকে অপরূপ শোভাময় করে তুলেছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। প্রাকৃতিক এ শোভা মানুষের হৃদয়কে আনন্দিত করে আবার প্রকৃতির প্রেমে মানুষের মন বাঁধা পড়ে যায়। এই সুদৃঢ় বন্ধন ত্যাগ করে কেউ পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় গ্রহণ করতে সম্মত হয় না।

ভাব-সম্প্রসারণ

গদ্যাংশের ভাব-সম্প্রসারণ

১. ভোগে নয়, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ।

[রা. বো. '১৬; য. বো. '১৭; কু. বো, '২০: চ. বো, '১৬; সি. বো, '১৬, '১৪; ব. বো, '১৬; দি. বো. '১৯, '১৬] [বগুড়া জিলা স্কুল, বগুড়া; সেন্ট প্লাসিডস্ হাই স্কুল; বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বান্দরবান; চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম; চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্তঃবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল, দিনাজপুর; ময়মনসিংহ জিলা স্কুল, ময়মনসিংহ; আনজুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোনা]

ভাব-সম্প্রসারণ: ত্যাগ করতে না পারলে ভোগ করে আনন্দ পাওয়া যায় না। স্বার্থলোলুপতা, ভোগাকাঙ্ক্ষা বা আত্মসুখপরায়ণতা মনুষ্যত্বের পরিপন্থি। যে ব্যক্তি শুধু নিজের স্বার্থচিন্তায় তৎপর, নিজের ভোগবিলাসে নিমজ্জিত, জগৎ ও জীবনের বৃহত্তর অঙ্গন থেকে সে স্বেচ্ছানির্বাসিত। জগৎবাসীর ভালোমন্দ, সুখদুঃখ, মঙ্গল-অমঙ্গল তার হৃদয়মনকে স্পর্শ করে না, এ পৃথিবীর আলো-আঁধার তার মানসরাজ্যে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। বিরাট এ জগৎ সংসারের কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কে যে একান্ত নির্লিপ্ত ও উদাসীন, তার মানব জনম বৃথা। তার বেঁচে থাকা না থাকা সমান। কেননা জীবনের সার্থকতা তথা মনুষ্য জন্মের সফলতা কখনো স্বার্থপরতায় নিহিত নয়। মানুষের যে দুর্লভ গুণটি তাকে অপরাপর সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে তা-ই মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্বের সারকথা, জাগ্রত বিবেককে শুভ ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করা। অপরাপর প্রাণীর প্রতি সহজাত মমত্ববোধ মানুষকে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত করে তোলে। তাই মানুষকে হতে হয় অপরের হিতৈষী। আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে পরের কল্যাণে নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যেই মনুষ্যত্ববোধের বিকাশ ঘটে। ভোগ মানুষকে অবসন্ন করে, তার চিন্তাশক্তিকে ভোঁতা করে ও জীবনকে হীনতার অভিশাপপুষ্ট করে। আগুনে ঘি ঢাললে আগুন যেমন না নিভে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি ভোগবিলাসীর জীবনও নতুন থেকে নতুনতর ভোগের নেশায় বহু গুণ বেগে জ্বলতে থাকে। অথচ ত্যাগের মধ্যেই পরম শান্তি লাভ করা যায়, জীবনকে গৌরবান্বিত করে তোলা যায়। ত্যাগ মানুষের পরম লক্ষ হওয়া উচিত। ভোগীকে কেউ মনে রাখে না, মনে রাখে ত্যাগীকে। এ পৃথিবীতে মানুষের জন্মই হয়েছে মানুষের তথা সৃষ্টির উপকার করার জন্য। যে মানুষ শুধু পেতেই চায় দিতে চায় না, সে পাওয়ারও উপযোগী নয়। তাকে কোনো কিছু দান করার অর্থই হবে অপাত্রে প্রদান। বস্তুত ত্যাগের মধ্যেই পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও সুখ। এ জন্যই বলা হচ্ছে ভোগে সুখ নাই, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ।

২. শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। **[য. বো. '২২; চ. বো. '১২]**

ভাব-সম্প্রসারণ: শিক্ষা অমূল্য সম্পদ। একটি জাতির বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য শিক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড ও উন্নতির পূর্বশর্ত।

মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে মেরুদণ্ডের অপরিহার্যতা অপরিসীম। মেরুদণ্ড ছাড়া মানুষ যেমন চলাচল করতে পারে না, তেমনি শিক্ষা ছাড়া একটি জাতি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে না। মেরুদন্ডহীন প্রাণী যেমন পরমুখাপেক্ষী হয়ে জীবন কাটায় তেমনি শিক্ষাহীন একটি জাতি পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে।

মানবজীবন তথা জাতীয় জীবনে নিরক্ষরতার মতো নারকীয় অভিশাপ আর নেই। বিদ্যাহীন মানুষ পশু সমতুল্য। তাই কবি বলেছেন- "বিদ্যাহীন মানুষ পশুর সমান।" শিক্ষা মানুষকে সত্যিকার মানুষরূপে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। আর শিক্ষাহীনতা মানুষকে অমানুষ করে তোলে।

তাই আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করে প্রথমেই জ্ঞান দান করেন এবং শিক্ষার গুরুত্ব প্রতিপন্ন করতে তিনি হযরত মহাম্মদ (স)- এর ওপর কুরআনের প্রথম বাণী নাযিল করেন 'ইকরা' অর্থাৎ 'পড়'। বিশ্বনবি (স) বলেছেন, "শিক্ষালাভের জন্য সুদূর চীনদেশে যেতে হলেও যাও।" মহানবি (স) আরও বলেছেন- "শহিদের রক্তের চেয়ে বিদ্বানের কলমের কালির মূল্য ও মর্যাদা অনেক বেশি।" নিরক্ষরতা সমাজের শত্রু, দেশের শত্রু, জাতির শত্রু, জগতের শত্রু, এবং আল্লাহর শত্রু। দেশমাতৃকার উন্নতির জন্য তাই সর্বপ্রথম প্রয়োজন দেশের আপামর জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে- Education is the backbone of a nation. তাছাড়া যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত। সাম্প্রতিক বিশ্ব মানুষের শক্তি ও কর্মের প্রভাবে প্রভাবিত। এ শক্তি মানুষ শিক্ষার সাহায্যে লাভ করেছে। মানুষ বিবেকবান জীব। পশুপাখির চেয়ে সে উন্নততর। এ শিক্ষা ও জ্ঞানের সাহায্যে সে অন্য প্রাণীর ওপর প্রভুত্ব করতে পারছে। জাপান বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে। অথচ জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মুখ থুবড়ে . পড়েছিল। কিন্তু নিরলস পরিশ্রম, শিক্ষা ও বুদ্ধির দ্বারা আজ তারা উন্নত। আমেরিকানরা সারা বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছে শুধুমাত্র শিক্ষার দ্বারা। শিক্ষাহীনতা তথা নিরক্ষরতার কারণে সকল দেশের রানি আমার জন্মভূমি জননী আজ দরিদ্র। তাই শিক্ষাকে সহজলভ্য করে প্রতিটি মানুষের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দেওয়ার উপায় আমাদের উদ্ভাবন করতে হবে। তবেই দেশের জনগণ শিক্ষিত হবে। আর জনগণ শিক্ষিত হলে দেশ ও জাতি উন্নত হবে।
যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত। অশিক্ষিত কোনো জাতি বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। কারণ শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। তাই দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্য সকলকেই শিক্ষিত হতে হবে।

৩. দুর্নীতি জাতীয় জীবনে অভিশাপস্বরূপ।

[ঢা, বো. ০৫; রা. বো, '১৪, '১১, '০৫; য. বো. '১১, ০৫; কু. বো. '১১; সি. বো. '০৪; ব. বো. '১১] ইবনে তাইমিয়া স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা।]

অথবা, দুর্নীতি জাতির সকল উন্নতির অন্তরায়।

[ঢা. বো. ১৫; রা. বো. '০৭; কু. বো. '১৫; সি. বো. '১৯, '১৭, '০৯; চ. বো. '২২. '১৩, '১০; দি. বো, '২০, '১১; ম. বো, '২২, '২০]

ভাব-সম্প্রসারণ: নীতির বিরুদ্ধাচারণ-ই দুর্নীতি। অর্থাৎ প্রচলিত আইন ও নীতি-নৈতিকতাবিরোধী কাজকে দুর্নীতি বলে। জাতীয় জীবনে এ দুর্নীতি বিরাজ করলে তা জাতির সর্বনাশ ডেকে আনে। এর প্রভাবে একটি জাতির স্বপ্ন ও সম্ভাবনা অঙ্কুরেই শেষ হয়ে যেতে পারে; হারিয়ে যেতে পারে অতীত ঐতিহ্য।
সত্য ও ন্যায় পথ একটি জাতির জন্য একান্ত অপরিহার্য। কেননা, সত্য ও ন্যায়ের পথে অগ্রসর হলে অবশ্যই সে জাতির উন্নতি সহজ হয়। তাই সত্যের সাধনা জাতির প্রধান কাজ। ন্যায়নীতির পথে চলে জাতি উন্নতির শীর্ষে উঠতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে যেসব জাতি উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়েছে, তার পেছনে কাজ করেছে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা। অন্যদিকে জাতীয় জীবনে যদি দুর্নীতির প্রবেশ ঘটে তবে সে জাতির উন্নতির পথ হয়ে যায় রুদ্ধ। তখন জাতির সামনে নেমে আসে ঘোর অমানিশা। অন্যায় বা দুর্নীতি যে জাতির মধ্যে বিরাজ করে সে জাতি নানা অনাচারে মগ্ন হয়। ফলে লোকে জাতির উন্নতির কথা ভুলে গিয়ে নিজের সুখ, সুবিধা ও স্বার্থের কথা ভাবতে থাকে।

কীভাবে অন্যকে ঠকিয়ে নিজের লাভের পরিমাণ বাড়ানো যায় দুর্নীতিবাজ মানুষ সে চিন্তাই করে। এক্ষেত্রে নিজের লোভই বড় হয়ে দেখা দেয়; অন্যের মঙ্গলের কথা লোকের ভাবনায় আসে না।

আমরা দেখি পৃথিবীর ইতিহাসে যেসব জাতি উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পেরেছে তার পেছনে কাজ করেছে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা। অন্যায় বা দুর্নীতি যে জাতির মধ্যে বিরাজ করে সে জাতি নানাবিধ অনাচারে লিপ্ত হয়। যেসব জাতি দুর্নীতিতে আক্রান্ত হয়েছে সেসব জাতি কোনো দিনও উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে পারবে না। দুর্নীতি প্রত্যেকটি জাতির বিশেষ করে মানবজাতির জীবনে অভিশাপস্বরূপ। কোনো জাতির জীবনে যদি দুর্নীতি প্রবেশ করে তবে সেখানে স্বার্থের যে খেলা চলে তাতে জাতির উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যায়। সে কারণে দুর্নীতিকে জাতীয় জীবনে অভিশাপ বিবেচনা করা হয়। এ অভিশাপ জাতির সর্বনাশ ঘটায়। মানুষের জীবনে তখন নেমে আসে চরম দুঃখ-দুর্দশা। কোনো জাতির জীবনে যদি দুর্নীতি প্রবেশ করে তবে সেখানে স্বার্থের যে লীলা চলে, তাতে জাতির উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সে কারণে দুর্নীতিকে জাতীয় জীবনে অভিশাপ বলা হয়ে থাকে। সমস্যার সমাধান তাই অত্যন্ত জরুরি।

৪. প্রয়োজনীয়তাই উদ্ভাবনের জনক। **[ঢা. বো, '০৯] [মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]**

ভাব-সম্প্রসারণ: নতুন কোনো কিছু আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মূল চাবিকাঠি হলো প্রয়োজন। প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ নিত্যনতুন উদ্ভাবনে ব্যাপৃত হয়। সব সৃষ্টির পেছনেই একটি রহস্য বা কারণ রয়েছে। এ জগতে কোনো কিছু আকস্মিকতার সৃষ্টি নয়। একদিন আমাদের পূর্বপুরুষেরা বনে-জঙ্গলে বাস করত। চকমকি দিয়ে আগুন জ্বালাত। বৈজ্ঞানিকের চমকপ্রদ উদ্ভাবন তখন অজ্ঞাত ছিল। মানুষের দৈনন্দিন কাজের প্রয়োজনে সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। তার চিন্তাভাবনা বেড়েছে। মানুষের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার বা উদ্ভাবন হয়েছে। কালক্রমে আগুন আবিষ্কার হলে মানুষ 'কাঁচা মাংস আগুনে ঝলসে খেতে শুরু করে। জীবজন্তুর আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়ার প্রয়োজনে মানুষ ঘর বাঁধতে শিখে এবং নারী- পুরুষ অগ্নিকে সাক্ষী করে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয় ও দাম্পত্য জীবন শুরু করে। এভাবে মানুষ সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের শুভ সূচনা করে। তখন পুরুষেরা ফসল ফলানোর এবং নারীরা সুস্বাদু রান্নার বিভিন্ন কৌশল আয়ত্ত করে ফেলে। এভাবে মানুষ ক্রমান্বয়ে প্রয়োজনের তাগিদে নগর সভ্যতার পত্তন করে এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের পথ বেয়ে বর্তমান সভ্যতা ও উন্নতির ভিত গড়ে তোলে। কালক্রমে তারা এক এক সময় এক এক জিনিসের অভাবের কথা বুঝতে পেরেছে। প্রয়োজনের কথা গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করেছে। অন্ধকার দূর করা প্রয়োজন বিধায় বিদ্যুৎ উদ্ভাবন করেছে।

যাতায়াতের সুষ্ঠু ব্যবস্থা একসময় ছিল না, বাহন ছিল না; তারপর রাস্তাঘাট তৈরি করেছে, স্টীম ইঞ্জিন, রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন এবং আরও অনেক যান উদ্ভাবন করেছে। দূরাঞ্চলের মানুষের কথা শোনা দরকার, পর্দায় ছবি দেখা দরকার; উদ্ভাবন করা হলো চলচ্চিত্র, টেলিফোন, টেলিস্কোপ, টেলিগ্রাম, টেলিভিশন, ভি.সি.আর. ইত্যাদি। প্রয়োজনীয়তা না থাকলে এগুলো উদ্ভাবনের কথা চিন্তাও করা যেত না। আলো জ্বালানোর দরকার। তাই দিয়াশলাই, লাইটার উদ্ভাবন করেছে। আবার রোগ, শোক, জরা-ব্যাধিকে দূরে নিক্ষেপ করার জন্য এক্সরে আলট্রাসনোগ্রাফির উদ্ভাবন করেছে। নানা দুরারোগ্য ব্যাধি ও ওষুধ আবিষ্কার করার প্রয়োজনের কথাও মনে হয়েছে। ফলে আবিষ্কার করেছে পেনিসিলিন, ক্লোরোমাইসিন ইত্যাদি। এভাবে চলছে একের পর এক আবিষ্কার। প্রয়োজন না থাকলে মানুষ

কিছুই আবিষ্কার করার প্রয়াস পেত না।তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রয়োজনই মানুষকে নতুন নতুন জিনিস ও কৌশল উদ্ভাবনে অনুপ্রাণিত করেছে এবং তাকে উন্নতির স্বর্ণ শিখরে পৌছে দিয়েছে।

৫. রাত যত গভীর হয়, প্রভাত তত নিকটে আসে।

[ঢা. বো. '০১; রা, বো. '০৬; কু. বো: '০৫) (রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, রাজশাহী; রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, উত্তরা, ঢাকা; ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা: সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, টঙ্গী, গাজীপুর; নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ; বনফুল আদিবাসী গ্রীনহার্ট কলেজ, ঢাকা; ক্যামব্রিয়ান স্কুল ও কলেজ, ঢাকা; বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল; মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর; জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট; নবাব ফয়জুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা; আলী আমজাদ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার; বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বরিশাল; পিরোজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পিরোজপুর]

ভাব-সম্প্রসারণ: কথায় আছে, "জীবন একটা দুঃখ-সুখের গান"- বাস্তবতা তাই। জীবনের পরতে পরতে হাসি-আনন্দ, দুঃখ-কষ্ট মিলেমিশে থাকে। দুঃখ-কষ্টের নির্মম কশাঘাতে জীবন হয়ে ওঠে সুচিশুভ্র। রাতের শেষে যেমন সকালের সোনা রোদ, মেঘের আড়ালে যেমন সূর্য; দুঃখ অবসানে তেমন সুখ বিরাজমান।

ইংরেজিতে একটি কথা আছে, "Adversity often leads to prosperity" অর্থাৎ "দুঃখের পরিণতি সুখে।" মানবজীবন দুঃখ-সুখের জীবন। হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ সবই জীবনের অনুষঙ্গ; একটি গাঁথা কাব্য। একটি ছাড়া অন্যটি অর্থহীন। জীবনের পথে চলতে হলে বাধা আসবে, আসবে কণ্টকাকীর্ণ পথ, কিন্তু তা দেখে ঘাবড়ে গেলে চলবে না। এগিয়ে যেতে হবে সম্মুখ পানে। মানবজীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কিংবা অহর্নিশ কষ্ট চলতে থাকলে জীবন অর্থহীন হয়ে যেত। দিন শেষে যেমন আঁধারে ঢেকে যায় পৃথিবী আবার সে তমিশ্রার আঁধার কাটতে থাকে মুহূর্তে মুহূর্তে উদিত হয় আকাশে উষা, নদীতে জোয়ার আসে দু'কূল ছাপিয়ে; জোয়ার শেষ হতে থাকে তার অর্থ ভাটা শুরু হতে থাকে। আকাশে মেঘ জমে তার আড়াল থেকে 'সূর্য্যি মামা' হাসতে থাকে। জীবনও এমনি এক খেলা। যেখানে সুখের পরে দুঃখ কিংবা কষ্টের পরে সুখের অবারিত হাতছানি। সুখ-দুঃখ পর্যায়ক্রমে আসে। দুঃখের কালছোবল ফণা তুলে আঘাত করে তার বিষবাষ্পে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে কিন্তু মানুষকে ভুলে গেলে চলবে না যে-দুঃখেরও শেষ আছে। ধৈর্য দিয়ে সহ্য করলে দুঃখের শেষ সুনিশ্চিত।

দুঃখ-কষ্টের তীব্রতা মানুষকে নিরাশ করে তোলে। কষ্টের সাগরে মানুষকে ভুলে গেলে চলবে না যে, দুঃখ যত তীব্রই হোক না কেন তার পরেই সুখ, সুখের সূর্য হাতছানি দিয়ে ডাকে তাকে। প্রতি মুহূর্ত যেমন রাতের গভীরতাকে আরও গভীর করে তেমনি করে রাতের আয়ু এক এক মুহূর্ত করে কমতে থাকে। সহজ কথায়, রাতের গভীরতা যতই বাড়ে প্রভাত ততই নিকটবর্তী হয়। মেঘের আড়ালে যেমন সূর্য হাসে তেমনি মানবজীবনের দুঃখ-কষ্ট। দুঃখ-কষ্টের আড়ালেই অপেক্ষা করে দিগন্ত জোড়া ভোরের সূর্য-সুখ। সুখের পায়রা উড়তে চায় নীল আকাশে। একটু ধৈর্য ধরে, বুকে সাহস সঞ্চার করে আপন কর্ম করে গেলেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। দুঃখের দিনে ধৈর্যহারা হলে চলবে না। আশায় বুক বাঁধতে হবে, অপেক্ষা করতে হবে সুখের সোনালি দিনের। দুঃখের অমানিশার সমাপ্তি এক দিন ঘটবেই। অতএব আমাদের উচিত বিপদে ধৈর্যহারা না হয়ে কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের জন্য অপেক্ষা করা।

উত্থান-পতনের আবর্তে মানবজীবন গতিশীল। সুখদুঃখ এখানে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জীবনে দুঃখ-কষ্ট আসতেই পারে- তখন হতাশ না হয়ে ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করলেই আবার সুখের সোনালি দিনের দেখা পাওয়া যাবে। কারণ, সকল আঁধার রাতের সমাপ্তি হয় ঊষার আকাশের রক্তিম বর্ণাভার আভাসে।

৬. প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।

[রা. বো. '২০; কু. বো. '০৬; ব. বো, '০৫] [রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, রাজশাহী; আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা সেনানিবাস; রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, উত্তরা, ঢাকা; ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা; হলি ক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা; বনফুল আদিবাসী গ্রীনহার্ট কলেজ, ঢাকা; ইসলামি এডুকেশনাল ট্রাস্ট (আইইটি) সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়; সারদাসুন্দরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদপুর; বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া; রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল, রাজশাহী; মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর; কুমিল্লা জিলা স্কুল, কুমিল্লা, নোয়াখালি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নোয়াখালী; কুমিলা মডার্ন হাই স্কুল, কুমিল্লা; ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম; বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল; উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশাল; পিরোজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পিরোজপুর; গাইবান্ধা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গাইবান্ধা; ময়মনসিংহ জিলা স্কুল, ময়মনসিংহ; গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ময়মনসিংহ।]

ভাব-সম্প্রসারণ: প্রাণী মাত্রই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে জীবন অতিবাহিত করে। কিন্তু মানুষকে সভ্যতার সাথে সংগ্রাম করে মানবিকতার স্ফুরণ ঘটিয়ে সত্যিকার মানুষ হতে হয়।

স্রষ্টার সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষের পার্থক্য এখানেই যে, মানুষের মন বলে একটি আলাদা অস্তিত্ব আছে। মন আছে বলেই বিশেষ বিশেষ অনুভূতির বিকাশ ঘটে এবং মানুষের সঙ্গে অন্য প্রাণীর পার্থক্য সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাণ আর মন এক নয়। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টির মধ্যে তা একত্রে থাকে না। সেজন্য মানুষ বিশেষ গুণ নিয়ে সৃষ্টির সেরা জীব বলে বিবেচিত। প্রাণের দিক দিয়ে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য না থাকলেও মনের দিক দিয়ে এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। মন আছে বলেই মানুষ মঙ্গলের পথে, কল্যাণের পথে, সত্য ও সুন্দরের পথে, ন্যায়ের পথে চলতে অভ্যস্ত। মানবিক মূল্যবোধের কারণে মানুষ আর্তপীড়িত, ব্যথিতের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। নিরন্নকে অন্নদান করে, মন আছে বলেই মানুষ অন্যকে ভালোবাসে। মনই মানুষকে জ্ঞানী ও সংবেদনশীল করে গড়ে তুলতে পারে। সুখ- দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদি অনুভূতি মানুষের মনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যার মধ্যে এ ধরনের কোনো অনুভূতি থাকে না তাকে স্বাভাবিক মানুষ বলে বিবেচনা করা হয় না; সে তখন অন্য প্রাণীর মতোই হয়ে পড়ে। প্রখ্যাত মনীষী দানিয়েলের ভাষায়- "একটি সুন্দর মন অন্ধকারে আলোর মতো, যার মাধ্যমে কলুষতার মাঝেও নিজের অস্তিত্বকে মর্যাদাসম্পন্ন রাখা যায়।" মানুষের এই সৃজনশীল ক্ষমতা ও মননশীলতা অন্যান্য প্রাণীর ওপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। তাই বলা যায়-মন থাকলে মানুষ হয়, প্রাণ থাকলে প্রাণী। মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য।

মনুষ্যত্ব বিকাশের মাধ্যমে সত্যিকারের মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে মানুষ হয় পূর্ণ মানুষ।

৭. কীর্তিমানের মৃত্যু নাই।

[ঢা. বো. '১৭, '১৩; রা, বো. '২২, '১০, '০২; য. বো, '১৫; চ. বো, '১৯, '১৭, '১৪; সি. বো. '১৩, '০৮; দি. বো, '০৯]

অথবা, মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নহে।

[ঢা. বো. '০৪; রা, বো, '১৯, '১৭, '১৫; '১০; য. বো, '১৯, '১৩; চ, বো. '১৪, '০৯; সি. বো. '১৫; ব. বো, '১৩, '১১, '০৮]

ভাব-সম্প্রসারণ: মানুষ মরণশীল হলেও কর্মগুণে অমরত্ব লাভ করা সম্ভব। বেঁচে থাকার মানে জৈবিকভাবে বেঁচে থাকা নয়, অমরত্ব লাভ করা। সংক্ষিপ্ত মানবজীবনকে অনন্তকাল বাঁচিয়ে রাখতে হলে তথা স্মরণীয়-বরণীয় করে রাখতে হলে কল্যাণকর কর্মের কোনো বিকল্প নেই।

মৃত্যু অনিবার্য, এটি চিরন্তন সত্য। তবুও মানুষ তাঁর সৎকর্মের মাধ্যমে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারেন। সেজন্য যাঁরা কীর্তিমান তাঁরা তাঁদের সেবামূলক কাজের মাধ্যমে মানবসমাজে বেঁচে থাকেন বহু যুগ ধরে। এ নশ্বর পৃথিবীতে সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ, কোনো মানুষই পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে না। সেজন্য দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা বড় কথা নয়, কারণ এতে তার অমরত্ব আসে না। মানুষ অমরত্ব পায় তার কর্মের মাধ্যমে। কর্ম তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে সাধারণ মানুষের অন্তরে চিরদিন। অর্থাৎ, যেসব মানুষ নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারে আত্মনিয়োগ করেন, মানুষের কল্যাণে নিজেদেরকে বিলিয়ে দেন- মৃত্যুর পরেও তাঁরা অমর হয়ে থাকেন মানুষের মাঝে। এভাবে কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব তাঁদের সৎ কর্মের জন্য অমরত্ব প্রাপ্ত হন। এসব লোকের দৈহিক মৃত্যু হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা অমর। সর্বদাই তাঁরা মানবের অন্তরে বিরাজ করেন। মানুষ তাঁদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কীর্তিমান ব্যক্তিবর্গের জীবনাদর্শই যুগ যুগ ধরে মানুষের পথপ্রদর্শক হয়ে থাকে। সুতরাং তাঁদের মৃত বলে মনে হয় না।

মানুষ বেঁচে থাকে তার কর্মের মাধ্যমে, তার বয়সের জন্য নয়। কত কোটি কোটি মানুষ এ পৃথিবীতে এসেছে। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর কেউ তাদেরকে মনে রাখে নি। তারা ভেসে গিয়েছে কালস্রোতে। অথচ যেসব কীর্তিমান ব্যক্তিবর্গ মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁরা অমর। তাই সক্রেটিস, প্লেটো, গ্যালিলিও প্রমুখ কীর্তিমান ব্যক্তিবর্গের মৃত্যু হয়েছে বহুদিন পূর্বে কিন্তু তাঁরা আজও চির ভাস্বর মানুষের হৃদয়ে।

নশ্বর পৃথিবীতে মানুষ অবিনশ্বর হয় কর্মগুণে। কাজেই দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার মধ্যে সার্থকতা নেই, যদি তা হয় কর্মগুণহীন। এজন্যই বলা হয়েছে যে, মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়।

৮. পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি।

[রা. বো. '১৯; য. বো. '০৪; কু. বো. '১৯; ব. বো. '১২, '০৬, '০৩; দি. বো, '২২, '১৫]

ভাব-সম্প্রসারণ: শ্রমই মানুষের জীবনে সৌভাগ্যের তিলক এঁকে দেয়। প্রতিটি মানুষেরই সৌভাগ্য কাম্য কিন্তু পরিশ্রম ছাড়া তা অর্জন অসম্ভব। শ্রমই মানুষের জীবনে সৌভাগ্যের তিলক এঁকে দেয়। তাই পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই।

পরিশ্রম সাধনায় সিদ্ধি এনে দেয়। বিদ্যার্থী যথারীতি পরিশ্রম করে। সে যেমন বিদ্যা অর্জন করে তেমনি ধন, মান ইত্যাদিও অর্জন করতে পারে। মানবজীবন সংগ্রামের জীবন। সে সংগ্রামে টিকে থাকতে হলে, জয়লাভ করতে হলে, পরিশ্রমকে প্রধান হাতিয়াররূপে বরণ করে নিয়ে সেপথে অগ্রসর হতে হবে। এই কর্মময় সংসারে ভাগ্য বলে কোনো অলীক সোনার হরিণের সন্ধান অদ্যাবধি মিলে নি। বাহ্যদৃষ্টিতে মানুষ যাকে ভাগ্যদেবী নামে অভিহিত করে, তা মূলত মানুষের প্রাণান্ত প্রচেষ্টারই ফসল। মানুষ নিরলস প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত ত্যাগ স্বীকারের বদৌলতে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি হাসিল করে। কর্মবিমুখ ব্যক্তি অলস চিন্তার প্রশ্রয়ে যা কিছু চিন্তা ভাবনা করে তা আকাশ কুসুম রচনার মতোই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ভাগ্যদেবী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কারুর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের সংস্থান করে দিয়েছেন এমন নজির মর্তলোকে মেলে না।

মানব ইতিহাস থেকে প্রমাণ মিলে যে, সৃষ্টির প্রারম্ভিক স্তরে অসহায় মানুষ যখন হিংস্র প্রাণীর উপদ্রব ও বৈরী প্রকৃতির নির্মমতার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য বুকফাটা আহাজারি শুরু করেছিল, তখন কোনো ঐশীশক্তি বা দেবতা তার আহ্বানে সাড়া দেয় নি। তখন মানুষই একে অন্যের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছে এবং পরস্পরের সহযোগিতায় বৈরি প্রকৃতির সাথে নিরলস সংগ্রাম করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। শুধু তাই নয়, মানুষ আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে স্তরে এসে পৌছেছে তা তার পরিশ্রমেরই সোনালি ফসল। তাই নিঃসংশয়ে একথা বলা যায় যে, পরিশ্রমের দ্বারাই সৌভাগ্য অর্জন করা যায়; পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি।

পরিশ্রমের দ্বারাই প্রত্যেক মানুষের জীবনে উন্নতি আসে। শ্রমহীন অলস ব্যক্তির জীবন ও ভাগ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

৯. পাপীকে নয়, পাপকে ঘৃণা কর।

[ঢা. বো, '২০, '০১; রা. বো. '০১; য. বো. '০৮; সি. বো. '০২; ব. বো. '১৪]

ভাব-সম্প্রসারণ: পাপ পুণ্য মিলেই এ দুনিয়া। পাপ অপবিত্র কিন্তু পাপী অপবিত্র নয়। কেননা, সে পাপ দ্বারা কলুষিত। তাই পাপীকে নয় বরং পাপকে ঘৃণা করতে হবে।

পাপ বলতে আমরা অন্যায় অবিহিত কাজ, অধর্মকে বুঝি। যে অন্যায় কাজ, অধর্মের কাজ করে, তাকে আমরা পাপী বলি। সাধারণভাবে আমরা পাপ ও পাপী উভয়কেই ঘৃণা করি; কিন্তু এটা ঠিক নয়। পাপ অবশ্যই ঘৃণার কাজ, কারও জন্যই তা বাঞ্ছনীয় নয়। পাপের ফলে মানুষের ইহকাল ও পরকাল দু-ই নষ্ট হয়। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। পৃথিবীতে যখন একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে থাকে নিষ্পাপ। তার বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে চাওয়া-পাওয়ার প্রসার ঘটে। না চাইতেই যে পায় সে হয়ত এ সংঘাতকে এড়াতে পারে। কিন্তু যে শিশু জন্মের পর থেকে বা পরবর্তীতে বিরূপ পরিবেশে বড় হয়, দুঃখকষ্ট, ক্ষুধা আর নির্যাতনের সাথে যার বাস, জীবনের প্রয়োজনে তার পক্ষে সমাজের নিষিদ্ধ পথে, পাপের পঙ্কিল পথে পা বাড়ানো অস্বাভাবিক নয়। বাধ্য হয়েই সে পাপী হয়। কিন্তু জন্মের সময় তো সে পাপী ছিল না। বরং পরিবেশের প্রতিকূলতাই তাকে পাপী করেছে। অনুকূল পরিবেশ পেলে; স্নেহের, ভালোবাসার একটু পরশ পেলে হয়তো বা তার হৃদয়ে সৃষ্টি হতে পারে অনুতাপের অমিয় ধারা।

এ জগতে এমন অনেক উদাহরণ আছে, যাঁরা জীবনের একটি সময়ে অনেক পাপ কাজ করেছেন কিন্তু পরবর্তী জীবনে তাঁরাই মানবকুলের শিরোমণি হিসেবে নিজেদের স্থান নিশ্চিত করেছেন। উদাহরণ হিসেবে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)-এর কথা বলা যায় যিনি ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-কে হত্যার জন্য উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে হযরতের (স) দিকে ছুটে গিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি হয়েছেন আদর্শ পুরুষ। তাই পাপীকে ঘৃণা করে সমাজকে কলুষমুক্ত করা সম্ভব নয়। সেজন্যই পবিত্র হাদিসে বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো পাপকার্য অনুষ্ঠিত হতে দেখলে সে যেন হাত দিয়ে তাতে বাধা দেয়, নয়তো মুখ দিয়ে তা নিষেধ করে। আর যদি তাও না পারে তবে যেন অন্তত অন্তর দিয়ে সেই পাপকার্যকে ঘৃণা করে।" পাপ তাই সর্বদা বর্জনীয়; কিন্তু পাপীকে বর্জন করা বা ঘৃণা করা ঠিক নয়। কেননা মানুষ অনেক সময়ই পাপ করে নানা কারণে বা অবস্থার বিপাকে পড়ে। ইচ্ছা করে হয়তো সে তা করে নি। অথবা অজ্ঞতার কারণে কিংবা অভাব অনটনে পড়ে বা রিপুর তাড়নায় বাধ্য হয়ে সে পাপ করেছে। অনেকে পরিণাম না বুঝে অনেক কাজ করে যা অত্যন্ত খারাপ, কিন্তু তাদের বুঝিয়ে বললে তখন সে পাপের জন্য তারা অনুশোচনা করে, অনুতপ্ত হয়। এমতাবস্থায় পাপীকে ঘৃণা করা কখনো ঠিক নয়। বরং ক্ষমা করে মহত্ত্ব দিয়ে পাপীকে কাছে টেনে নিলে পাপীও পাপের পথ ছেড়ে সুপথে ফিরে আসে। মহানবী হযরত মুহম্মদ (স) তাঁর অশেষ ক্ষমাগুণ দিয়ে বহু - পাপীকে সৎপথে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

পাপীকে ঘৃণা করা যাবে না। পাপকে ঘৃণা করতে হবে, পাপীকে ক্ষমার মাধ্যমে সুপথে ফিরিয়ে আনতে হবে।

১০. আত্মশক্তি অর্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

[ঢা. বো. ২২,'১৯, '১৫, '১০; রা. বো. ১২, '০৮; য. বো. '১৪; কু. বো, '২২, '১৭, '১২, '০৯, '০৩; চ. বো. '২০, '০৬; সি. বো. '২২, '১২, '০৫; ব. বো. '০৯] [ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল: আল-আমিন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ, চাঁদপুর; ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ভোলা]

ভাব-সম্প্রসারণ: শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই হলো আত্মশক্তি অর্জন করা। আত্মশক্তি অর্জন করা প্রতিটা মানুষের কর্তব্য। যে ব্যক্তির কোনো আত্মশক্তি নেই সে পরনির্ভরশীল।

মানুষের বিভিন্ন মানবীয় ও মহৎ গুণাবলির মধ্যে আত্মশক্তি অন্যতম। কেউ আত্মশক্তিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারে, আবার কেউ পারে না। আত্মশক্তির বলে মানুষ নিজের শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে ও কাজকর্ম করতে পারে। আত্মশক্তি না থাকলে মানুষ নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। তখন সামান্য কাজেও তাকে অন্যের সাহায্যের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয়। আত্মশক্তি মানুষের মাঝে গুপ্তধনের মতোই অজ্ঞাতভাবে থাকে। আত্মশক্তি মানুষের একটি সুপ্ত প্রতিভা। শিক্ষার মাধ্যমেই এটা একজন মানুষের অন্তরে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে। যে শিক্ষা মানুষকে তার আত্মপ্রত্যয়ে উজ্জীবিত করে না, সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নয়। কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের এ সুপ্ত প্রতিভাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করা।

শিক্ষা মানুষকে আত্মবিশ্বাস প্রসারে সাহায্য করে। আত্মবিশ্বাস আত্মশক্তিরই নামান্তর। মানুষকে সুন্দর, সমৃদ্ধ ও সুখী জীবন লাভ করার জন্য অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়, অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয় এবং অনেক প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। আত্মশক্তি না থাকলে মানুষ এ সংগ্রামে বিজয়ী হতে পারে না। আত্মশক্তি দ্বারা মানুষ নিজের দোষ-গুণ, ভালোমন্দ বুঝতে পারে।

নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে আস্থাশীল হয়; জীবনের চরম ও পরম সত্য লাভ করতে সমর্থ হয়। নিজেকে বুঝতে, শিখতে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। শিক্ষাজীবনকে সুন্দর, সুচারু এবং আত্মনির্ভরশীলকূপে গড়ে তোলে। জীবন সার্থক হয়। হাদিসে আছে, "যে শিক্ষা গ্রহণ করে, তার মৃত্যু নেই।" মূলকথা হলো, মানুষকে আত্মশক্তি অর্জন করতে হলে শিক্ষিত হতে হবে, শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ যাতে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয় সেদিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। আর নিজেকে জানা, নিজের ক্ষমতা- অক্ষমতা, নিজের শক্তি-দুর্বলতা সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি করতে পারা শিক্ষার উদ্দেশ্য।

আত্মশক্তি মানুষের একটি সুপ্ত প্রতিভা। শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের অন্তরে যাতে আত্মশক্তি বিকশিত হয় সে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কারণ আত্মশক্তিহীন মানুষ পরমুখাপেক্ষী, যা কাম্য নয়।

১১. স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন।

[ঢা. বো. '০৬; য. বো. '০৬; ব. বো. '২২, '২০, '১৭]

ভাব-সম্প্রসারণ: স্বাধীনতা অর্জন করা সহজ নয়। স্বেচ্ছায় কেউ স্বাধীনতা পায় না। সংগ্রামের মাধ্যমে তা অর্জন করতে হয়। কিন্তু তদপেক্ষা বেশি সংগ্রামী, সতর্ক ও সৃষ্টিশীল হতে হয় স্বাধীনতা রক্ষায়। স্বাধীনতা অর্জন করা কোনো পরাধীন জাতির পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু সেই অর্জিত স্বাধীনতাকে রক্ষা করা আরও কঠিন কাজ বলে বিবেচিত হয়। স্বাধীনতা লাভ অত্যন্ত গৌরবের ব্যাপার। কিন্তু তা খুব সহজে লাভ করা যায় না। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বহু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয় এবং বহু রক্তপাতের ফলেই স্বাধীনতা আসতে পারে। কারণ, শক্তিমদমত্ত শাসকেরা কখনোই পদানত জাতিকে স্বাধীনতা দান করে না; রক্তপাতের মাধ্যমেই তা অর্জন করতে হয়।

তবে স্বাধীনতা অর্জিত হলেই তা চিরস্থায়ী হয় না। স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য আরও বেশি শক্তির প্রয়োজন। কারণ স্বাধীন দেশের ভেতরে ও বাইরে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি থাকে। সকলের হিংসাত্মক দৃষ্টি থেকে দেশকে রক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে। স্বাধীনতা বিরোধীরা ও শত্রুরা অদৃশ্যভাবে দেশের ক্ষতি করে। তাদের পরাভূত করা দুরূহ ব্যাপার। যথেষ্ট সচেতন ও সংঘবদ্ধ না হলে স্বাধীনতাকে রক্ষা করা যায় না। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্বাধীনতাকে মর্যাদা দিতে হয় এবং সদা সতর্ক থাকতে হয়।

স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে যেমন নির্ভীক যোদ্ধা হয়ে অস্ত্র হাতে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। তেমনি স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে কলম, কাস্তে হাতুড়ি নিয়ে অপেক্ষাকৃত কঠিন সংগ্রামে একতাবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে। তাহলেই স্বাধীনতা রক্ষা করা সহজ হবে।

১২. দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য।

[য. বো. '১১; কু. বো. '১৪; চ. বো, '১৫, '১১, '০৭; সি. বো, '২০; ব. বো. '১৯; দি. বো. '১৭, '১২]
[ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও, ঢাকা; ক্যামব্রিয়ান স্কুল ও কলেজ, ঢাকা; সরকারি পিএন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী; নাটোর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, নাটোর; নওগাঁ জিলা স্কুল, নওগাঁ; কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কক্সবাজার; বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বরিশাল; দিনাজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, দিনাজপুর, গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ময়মনসিংহ]

ভাব-সম্প্রসারণ: বিদ্বান হওয়া মানেই সুজন হওয়া নয়। চরিত্রহীন ব্যক্তিও বিদ্বান হতে পারে; সে দুর্জন। তার বিদ্যা মানবকল্যাণে ব্যয় হয় না। তাই তার সঙ্গ গ্রহণ কখনোই উচিত নয়, কারণ সে বিদ্বানের মোড়কে নিজেকে জড়িয়ে রেখে নিষ্কলুষ লোককে কলুষিত করতে পারে। অতএব সে পরিত্যাজ্য।

বিদ্বান ব্যক্তি সর্বত্র, সম্মান পান। বিদ্যার মতো এত অমূল্য সম্পদ মানুষের আর কিছুই নেই। বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো চরিত্র গঠন। লেখাপড়া শিখে যদি চরিত্রই গঠন করা না যায়, তবে সে বিদ্যার কোনো সার্থকতা নেই। চরিত্রগুণে গুণান্বিত ব্যক্তিরাই সমাজে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি যদি সুজন না হয় তাহলে তাঁর সান্নিধ্য কেউ কামনা করে না। বিদ্যাশিক্ষা করে যে ব্যক্তি বিদ্যার মর্যাদা দেয় না, মানুষের অপকার করে, স্বীয় স্বার্থ আদায়ে অমানুষ হয়ে যায় সে ব্যক্তিই দুর্জন। দুর্জনের দ্বারা বিদ্যার অপমান হয়। এরা বিষধর সর্পতুল্য। এদের দ্বারা সমাজ ও জাতির উপকারের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। এরা নিজেদের কাকতুল্য চেহারা ঢাকার জন্য সময়ে ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করতেও কার্পণ্য করে না। এরা ভদ্রবেশী শয়তান। মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে এরা সমাজের মানুষকে প্রতারণা করে।

সাগ বিষাক্ত প্রাণী। মানুষ তাকে ভয় করে। তার মাথায় মূল্যবান মণি থাকলেও মানুষ তার কাছে যেতে সাহসী হয় না। কাছে গেলে জীবননাশ সুনিশ্চিত। দুর্জন ব্যক্তি সাপের সাথে তুলনীয়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মণি আহরণ যেমন বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তেমনি চরিত্রহীন বিদ্বান ব্যক্তির সাহচর্যে গিয়ে বিদ্যাশিক্ষা করতেও ঝুঁকি আছে। এতে করে নিজের চরিত্র ধ্বংস হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। সাপের মাথায় মূল্যবান মণি থাকলেও যেরূপ মানুষ এড়িয়ে চলে, তেমনি চরিত্রহীন বিদ্বান ব্যক্তির সাহচর্যও সমভাবে পরিত্যাজ্য। দুর্জনের নিকট বিদ্যাশিক্ষা কাম্য নয়।

সমাজ-সভ্যতার উন্নয়নে অসৎ শিক্ষিত অসৎ মূর্খের চেয়ে বেশি বাধা। তাই শিক্ষিত দুর্জনদের চিহ্নিত করে তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত।

১৩. বিদ্যার সাথে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ এবং জীবনের সাথে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু।

[পাবনা জিলা স্কুল; মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর; বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

ভাব-সম্প্রসারণ: জীবনের জন্যই শিক্ষা। কিন্তু শিক্ষাকে অবশ্যই হতে হবে জীবনমুখী, তা না হলে সে শিক্ষা কোনো সুফল বয়ে আনে না। বিদ্যা মহামূল্যবান সম্পদ। কেউই এ সম্পদ অর্থের বিনিময়ে কিনতে পারে না। বিদ্যা মানবজীবনের অন্ধকার দূর করে এবং জীবনকে উজ্জ্বল, আলোকিত, সমৃদ্ধ ও পুণ্যময় করে। মনের কালিমা, অন্তরের গ্লানি ও হৃদয়ের আবিলতা দূর করে বিদ্যা মানবজীবনকে করে মহীয়ান, উদ্দীপ্ত ও তীক্ষ্ণ। বিদ্যার সংস্পর্শে জীবন হয় মোহমুক্ত, সতেজ ও আনন্দময়। বিদ্যার মাধ্যমেই পৃথিবীর তাবৎ রহস্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান আজ মানুষের মুঠোর মধ্যে অধিগত। বিদ্যার বলেই মানুষ পৃথিবীর অফুরন্ত সম্পদের সন্ধান লাভ করেছে, করায়ত্ত করেছে। অতএব বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে মানুষকে অন্ধ, অসহায়ের মতোই প্রতিকূল পৃথিবীতে সশঙ্ক জীবন-যাপন করতে হতো তাতে কোনো সংশয় নেই। কেবল চক্ষু থাকলেই সে পারত না এ পৃথিবীর সম্পদ সৌন্দর্যের সন্ধান করতে কিংবা তাকে অধিকারে আনতে, যদি না তার বিদ্যা থাকত। বিদ্যার সাথে সম্পর্কহীন তথা অশিক্ষিত ব্যক্তি দেশ ও দশের কল্যাণ করতে পারে না। শিক্ষার মাধ্যমেই মানবীয় গুণাবলি অর্জন সম্ভব। পঙ্গু চলাচলে অক্ষম। অন্যের সাহায্য ছাড়া সে চলতে পারে না। তাই তারা সমাজের জন্য বোঝাস্বরূপ। তাদের দিয়ে সমাজের কল্যাণকর কিছু আশা করা যায় না। তেমনি জীবনের সাথে সম্পর্কহীন বিদ্যা অচল। এটি মানুষের প্রয়োজন মিটাতে 1। বাস্তবতা বর্জিত বিদ্যা অসম্পূর্ণ। জীবন-কর্মে বিদ্যার প্রয়োগ অপারগ সুনিশ্চিত না হলে সে বিদ্যার অর্থশূন্যতা দেখা দেয়। জীবনধর্মী শিক্ষাই মানুষকে কর্মে ও জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। যুগোপযোগী শিক্ষা বাস্তবধর্মী ও কল্যাণমুখী। শিক্ষাহীন জীবন এবং জীবন-সম্পর্কহীন শিক্ষা কোনোটিই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত নয়। আমাদের কাম্য হওয়া উচিত সুশিক্ষা এবং জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষা।

১৪. বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না।

[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা; ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, টাঙ্গাইল; ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও, ঢাকা; সেন্ট প্লাসিডস্ হাই স্কুল, চট্টগ্রাম; রংপুর জিলা স্কুল।]

ভাব-সম্প্রসারণ: বই অপরিসীম জ্ঞানের আধার। বাজার থেকে অর্থের বিনিময়ে বই ক্রয় করা যায় সত্য কিন্তু সে বইয়ের মধ্য লিখিত আকারে যে জ্ঞানের প্রাচুর্য সন্নিবেশিত থাকে তা অর্থমূল্যে কেনা অসম্ভব। সে জ্ঞান আহরণ করে ব্যক্তি যেমন আত্মিকভাবে সমৃদ্ধ হয়, তেমনই আর্থিকভাবেও সাফল্য লাভ করার দ্বারে পৌঁছে যেতে পারে।

একটি ভালো বই জগৎ বিখ্যাত জ্ঞানী-মনীষীদের অভিজ্ঞতা, চিন্তা- চেতনা ও সৃষ্টিকর্মের লিখিত সংকলন।

এটি একটি যুগের মানুষকে তার পূর্ববর্তী যুগের মানুষের সৃষ্টি, আবিষ্কার, অভিজ্ঞতাসহ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করতে পারে। ফলে একজন মানুষ তা পাঠ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারে। সত্যকে উপলব্ধি করে তা ব্যক্তিজীবনে প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে সে উত্তরোত্তর জ্ঞানী মানুষে পরিণত হয়। সামাজিক বিবর্তন, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠান ও অর্থনৈতিক গতিশীলতাসহ শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে বিষয়ভিত্তিক বই সাহায্য করে। বর্তমানকালে পুঁজিবাদের জাঁতাকলে পিষ্ট মানুষ মনে করে, বই ক্রয় করা যেমন আর্থিক ক্ষতি সাধন, তেমনই বই পাঠ সময়ের অপচয়। তাই তারা বই কেনা এবং পড়া থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে, যা রীতিমতো মূর্খতার শামিল। মূলত বই পাঠের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে সে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে পারে। জীবনের লক্ষ্য স্থির করে ঐ বিষয়ের বই পাঠ করে সেই অভিজ্ঞতা জীবনে প্রয়োগ করলে মানুষ আত্মিক ও আর্থিক উন্নতি খুব সহজেই লাভ করতে পারে।

বই. কেনা এবং পড়া অর্থ ও সময়ের অপচয় নয়, বরং বিনিয়োগ। এ বিনিয়োগের ফল হাতেনাতে পাওয়া যায় না। সুদূরপ্রসারী এ বিনিয়োগ মানুষকে যথাসময়ে ধন-সম্পদ ও মর্যাদা দান করে, দেউলিয়া করে না।

১৫. দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।

[ঢা. বো. '১২; কু. বো. '০১; সি. বো. '০৯; দি. বো. '১৫] [সিটি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

ভাব-সম্প্রসারণ: বিলাসী নগরজীবন যখন নানা কারণে দুর্বিষহ হয়ে হয়ে ওঠে, তখন সচেতন মনে ধ্বনিত হয় 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও-এ নগর।' এখানে 'অরণ্য' বলতে প্রকৃতিনির্ভর জীবন বা natural life আর 'নগর' বলতে কৃত্রিম জীবন বা artificial life-কে বোঝানো হয়েছে।

প্রকৃতির সবকিছু পরস্পর বন্ধনে আবদ্ধ এবং পরস্পর নির্ভরশীল। গাছপালা, লতাগুল্ম একান্ত আপনার মতো মায়া-মমতায় জড়িয়ে থাকে। এর পাশে থাকে পাহাড়-ঝরনা-নদী-সমতলভূমি-শস্যভূমি। স্নিগ্ধ-প্রশান্ত-পবিত্রতার স্পর্শ সর্বত্র। সর্বত্র প্রাণের বিস্তার, স্বতঃস্ফূর্ততার প্রবাহ। এই প্রকৃতির মধ্য, প্রকৃতির কোলে যারা বাস করে তারা প্রকৃতিনির্ভর। তারা প্রকৃতির মতোই স্বচ্ছ, প্রশান্ত, উদার ও মহৎ। তাদের জীবন সহজ-সরল, কিন্তু উচ্ছল ও প্রাণবন্ত। সেখানে কোনো কৃত্রিমতা নেই অর্থাৎ মিথ্যা নেই, ষড়যন্ত্র নেই, প্রতারণা নেই, জটিলতা নেই। স্নেহ-মায়া-মমতায়, শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় জড়ানো গ্রামজীবন তাই পরিচ্ছন্ন, শান্তিময়, নিরাপদ ও সুখের আশ্রয়। সেখানে বিশুদ্ধ বায়ুপ্রবাহ, সতেজ শাকসবজি, আনন্দমুখর নির্মল জীবন। পাকা রাস্তাঘাট ও বিদ্যুতের ছোঁয়া পেলেও এখনও গ্রামজীবন প্রকৃতিনির্ভর।

অন্যদিকে নগর বা নাগরিক জীবনের পুরোটাই কৃত্রিম। এখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন নেই, তেমনি প্রকৃতি-নির্ভরতাও নেই। কেননা মানুষ বন কেটে, উঁচু ভূমি কেটে, নদীকে শাসন করে নির্মাণ করে নগর। দালানকোঠা, পাকা রাস্তাঘাট, কল-কারখানার বর্জ্য, ধুলাবালি, নানা রকম শব্দে পরিপূর্ণ নগরজীবন। এখানে বিশুদ্ধ বাতাসের অভাব, সতেজ খাবারের অভাব, প্রাণোচ্ছল জীবনের অভাব। সবকিছু দূষিত, কৃত্রিমতায় ভরা। এসব দমবন্ধ করা পরিবেশে মানুষ হাঁপিয়ে উঠেছে। তারা সজীব, শ্যামল, প্রাণবন্ত প্রাকৃতিক জীবন চায়- অরণ্যের প্রশান্ত কোল প্রার্থনা করে। উদার,

স্বচ্ছন্দ, জীবন্ত পরিবেশে প্রাণভরে শ্বাস নিতে চায়। তাজা গাছপালা, তাজা বর্ণময় ফুল দেখতে চায়। তাজা ফল, তাজা খাবার খেতে চায়। সর্বোপরি নির্মল ও প্রাণোচ্ছল জীবন-যাপন করতে চায়। তাই তো মানুষ সচেতন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উচ্চারণ করে- দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।

কবিতাংশের ভাব-সম্প্রসারণ

১৬. পরের অভাব মনে করিলে চিন্তন আপন অভাব ক্ষোভ রহে কতক্ষণ। [সি. বো. '১৯]

ভাব-সম্প্রসারণ: অভাব মানুষের মনে দুঃখবোধ ও ক্ষোভের জন্ম দেয়। কিন্তু আরো বেশি অভাবী বা নিঃস্ব মানুষের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করলে নিজের অভাববোধ দূর হয়ে যায় মুহূর্তেই।

মানুষের অভাব বা চাহিদার অন্ত নেই। একটা অভাব পূরণ হলে আরও অভাব প্রকট হয়ে দেখা দেয়। মানুষ নিজের অভাবকেই সবসময় বড় করে দেখে। এ কারণে দুঃখ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমাদের চারপাশে আরও অনেক অভাবী মানুষ আছে আমরা তাদেরকে দেখেও দেখি না। সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে তাদের কারও কারও অভাব আমাদের অভাবের চেয়েও কয়েকগুণ বেশি। তাদের কষ্ট-দুঃখ-যন্ত্রণা আন্তরিকভাবে অনুভব করলে নিজের দুঃখবোধ ও ক্ষোভ অবশ্যই তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে হবে। অথচ এই • তুলনাটুকু করে আমরা নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করি না, - নিজের ক্ষোভ প্রশমিত করার চেষ্টা করি না। একবার একজনের পায়ে জুতো ছিল না। সমাজের একজন সুপরিচিত মানুষ তিনি, অথচ তাঁর পায়ে জুতো নেই। এই দুঃখবোধ প্রতিমুহূর্তে তাঁকে কষ্ট দিচ্ছিল, মনে ক্ষোভের সঞ্চার করছিল। এই ক্ষোভ নিয়েই তিনি মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলেন। মন্দিরের সামনে গিয়ে দেখলেন একজনের দুটো পা- ই নেই। অথচ সে স্বাভাবিকভাবে কথা বলছে, হাসছে, তার কোনো দুঃখবোধই নেই। তিনি সচেতন হলেন, তাঁর বিবেক তাঁকে স্বাভাবিক' করে তুলল। কারণ তার তো দুটি পা-ই আছে, তিনি দিব্যি চলাফেরা করতে পারছেন। তাঁর চেয়ে তো বেশি কষ্ট তারই যার দুটো পা-ই নেই। এভাবেই তাঁর জুতো না থাকার ক্ষোভ মুহূর্তেই দূর হয়ে গেল। দুঃখ-কষ্ট নিয়েই মানুষের জীবন। সুখ তো আপেক্ষিক। দুঃখকে সহজভাবে মেনে নিয়ে তা দূর করার চেষ্টার মধ্যেই সুখ খুঁজে নিতে হবে। তাহলেই আর দুঃখের তীব্রতা থাকবে না। নিয়ন্ত্রিত দুঃখ অর্থাৎ সহজভাবে গ্রহণ করার দুঃখ কখনো ক্ষোভের পর্যায়ে পৌছাবে না। ফলে জীবন হয়ে উঠবে সহজ-স্বাভাবিক ও সুন্দর।

১৭. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন [ঢা.বো. '১৪] [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ভাব-সম্প্রসারণ: সফলতা অর্জন করতে হলে জীবনে প্রচুর সাধনার প্রয়োজন। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন মানবজীবনের প্রধান কাজ। তা সফল করতে হলে অবশ্যই নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। প্রতিটি মানুষই জীবনে অনেক অনেক বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে। আশায় বুক বাঁধে এই ভেবে যে, জীবনে সে অনেক বড় হবে, মানুষের মতো মানুষ হবে। কিন্তু জীবনের চলার পথ বড়ই কণ্টকাকীর্ণ। তাই কোনো কাজে সফলতা লাভ সহজ ব্যাপার নয়। বন্ধুর পথকে পায়ে ঠেলে দিয়ে সকল বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠার সোনালি দুয়ারে পা রাখা সম্ভব। এর জন্য চাই প্রচুর শ্রম, একনিষ্ঠতা, একাগ্রতা। রোগ, শোক, ব্যাধি জীবনীশক্তিকে স্তিমিত করে। লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তাই এসবকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। দেহ এবং মনকে রাখতে হবে সতত সচল। জীবনে যারা বড় হয়েছে তাদের জীবনী পড়ে আমরা জানতে পারি যে, কঠোর অনুশীলনের মধ্য দিয়েই তাঁরা নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলেছেন। কোনো প্রকার হেঁয়ালিপনা, আলস্য এবং জরাজীর্ণতা তাঁদেরকে বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। যে আদর্শকে তাঁরা বুকে ধারণ করেছেন সে আদর্শকে নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বময় শক্তি নিয়োগ করেছেন। নির্ভীক যোদ্ধার মতো অসীম সাহসে তাঁরা সম্মুখে অগ্রসর হয়েছেন। প্রত্যয়ের দৃপ্ত অঙ্গীকারে বেঁধে নিয়েছেন বুক। পাকাপোক্ত মাঝির মতো হাল ধরে পাড়ি দিয়েছেন অকূল সমুদ্র। তাঁরা খুঁজে নিয়েছেন সুবর্ণ দ্বীপ। আর যাদের কাজে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার অভাব ছিল, যারা বারবার আচ্ছন্ন হয়েছে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে, তারা কেউই জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি।

তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা অপূর্ণই রয়ে গেছে। হা-হুতাশ আর এক বুক দীর্ঘশ্বাস ছাড়া তারা জীবনে আর কিছুই সঞ্চয় করতে পারে নি। জীবনের বেলা শেষে নিয়তির হাতে নিজেদেরকে সমর্পণ করে তারা অসহায়ভাবে জীবনযাপন করছে। কিন্তু এমন জীবন কারো কাম্য হতে পারে না। তাই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে চাই সুন্দর স্বপ্ন, চাই উঁচু আশা, চাই আত্মবিশ্বাস, চাই ত্যাগ, চাই নিষ্ঠা। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই জীবনকে অনেক সুন্দরময় করে তোলা সম্ভব। প্রতিটি মানুষেরই সুন্দর জীবন, সুন্দর ভবিষ্যৎ একান্ত কাম্য। আর সে ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কঠোর পরিশ্রম। অনুশীলনই জীবনকে সুন্দর ও আনন্দময় করে তুলতে পারে এবং তা অস্বাভাবিক কিছুই নয়।

১৮. স্বদেশের উপকারে নাই যার মন

কে বলে মানুষ তারে? পশু সেইজন।

[সকল বোর্ড ২০১৮; ঢা. বো, '২২, '০৯, '০৭, রা, বো, '২২, '১৬, '১৪, '০৬; য. বো. '২০, '১৪, '০৯; কু. বো, '১৭, '১৬, '১৫, '১২, '০৬, '০৪; চ. বো, '২০, '১৭, '১৪, '১২, '০৮; সি. বো.''১২, '০৭; ব. বো. ১৪, '০১: দি. বো, '১৪]

ভাব-সম্প্রসারণ: মা, মাতৃভূমি, মাতৃভাষা প্রত্যেকের একান্ত আপনার ধন। আর এসবকে যে অবজ্ঞা করে সে কখনো প্রকৃত মানুষের মর্যাদা পায় না। তার মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে না।

দেশপ্রেম প্রতিটি মানুষেরই একটি একান্ত অনুভূতি। প্রত্যেক মনীষীই জন্মভূমিকে সর্বাগ্রে ভালোবাসার স্থান দিয়েছেন। কোনো এক দেশপ্রেমিক বলেছেন, "জননী জন্ম-ভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী।" অর্থাৎ, মা আর মাতৃভূমিকে স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন। জন্মের পর হতেই প্রতিটি মানুষের মাঝে নিজের অজান্তেই দেশপ্রেম গড়ে ওঠে। কেননা শৈশব হতেই প্রাণের সাথী হয়ে ওঠে জন্মভূমি। তাই প্রতিটি মানুষের নিকটই জন্মভূমি অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠে। এ স্বদেশের উপকার বা দেশকে রক্ষা করার জন্যে কত লোক যে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন তার কোনো হিসেব নেই, দেশের জন্য জীবন দিয়ে মানুষ রিক্ত হন না বরং হন তাঁরা ধন্য। তাঁরা কখনো মরেন না। শহিদ হয়ে অমর হয়ে থাকেন। যেমন- অমর হয়ে আছেন রফিক, সফিক, বরকত, সালাম এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর শহিদেরা বাংলাদেশের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার মানসে সবার জীবন গড়ে তোলা উচিত। স্বদেশের উপকার করতে গিয়ে মনের সংকীর্ণতা দূর করতে হবে। জন্মভূমির মঙ্গল মানুষ মাত্রেই অবশ্য করণীয়। স্বদেশের উপকার এবং কল্যাণের জন্যে যার মন নেই সে ঘৃণ্য। দেশপ্রেম সকল মহত্ত্বের উৎস, মনুষ্যত্বের প্রসূতি। যার মধ্যে দেশপ্রেম নেই, স্বদেশের হিতার্থে যে হিতাকাঙ্ক্ষী নয় সে পশুর চেয়েও অধম। তাকে দিয়ে কোনো মহৎ কাজ সাধিত হয় না। সে মানুষ নয় পশু সমতুল্য। স্বদেশের সম্মান, স্বাধীনতা, কৃষ্টি, আচার, সভ্যতা ও ভাষার জন্য যাঁরা জীবন দিতে পারেন তাঁরাই মানুষ। কেননা স্বদেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ।

নিজের দেশকে অবজ্ঞা করে কেউ কোনোদিন বড় হতে পারে নি। শত দুঃখ লাঞ্ছনার মাঝে থেকে আবার ফিরে আসতে হয়েছে স্বদেশের আঙিনায়। তাই প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য নিজের মাতৃভূমিকে ভালোবেসে তার সমৃদ্ধি সাধনে সচেষ্ট থাকা।

১৯. বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।

[য. বো. '০২; কু. বো, '০৯; সি. বো. '০৮; দি. বো. '১১] [ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম।]

ভাব-সম্প্রসারণ: মানবসভ্যতার ইতিহাস বলে, আদিকাল থেকে আজকের যে সভ্যতা তাতে নারী-পুরুষের সমান অবদান রয়েছে। নারী-পুরুষের সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টায় সভ্যতা সূচিত হয়েছে। সভ্যতা বিনির্মাণে কারো অবদানই কম নয়।

নারী এবং পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হয়েছে সমাজব্যবস্থা। সুতরাং সমাজে নারী এবং পুরুষের অবদান সমভাবে বিদ্যমান। এ' ও পৃথিবীতে নর এবং নারী একে অপরের পরিপূরক সত্তা। আদম এবং হাওয়ার অবদানেই এ জগতে মানুষের আবাদ হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে নারীরাও পুরুষের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। নারীরা পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনে তাদের উপর আরোপিত ছায়িত্ব পালন করছেন। তাই নারীদের কর্মস্থল শুধু রান্নাঘরে সীমাবদ্ধ নয় বরং পরিব্যাপ্ত সমাজের সকল অঙ্গনে। কথায় আছে "যে শকটের এক চক্র বড় এবং এক চক্র ছোট হয় সে শকট অধিক দূর অগ্রসর হতে পারে না: সে কেবল একই স্থানে ঘুরতে থাকবে।" অর্থাৎ যেখানে পুরুষ জাতিকে প্রাধান্য এবং নারীজাতিকে অবহেলা করা হবে সেখানে জাতির কোনো উন্নতি বা পরিবর্তন হবে না। তাইতো কবি বলেছেন,

"কোন কালে একা হয়নি কো জয়ী
পুরুষের তরবারি
শক্তি দিয়েছে প্রেরণা দিয়েছে
বিজয় লক্ষ্মী নারী।" [নারী- কাজী নজরুল ইসলাম]

ইসলাম ধর্ম সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে এবং শিক্ষার অধিকারসহ সকল অধিকার দান করেছে- "প্রত্যেক নর-নারীর বিদ্যা অর্জন করা ফরজ।" অন্ধকার যুগে নারীদের কোনো মর্যাদা দেওয়া হতো না। সে যুগে নারীরা দাসী ছিল এবং ন্যায্য অধিকার হতে তাদের বঞ্চিত করে রাখত, যা সময়ের বিবর্তনের মাধ্যমে পরিবর্তন হয়। এখন সারাবিশ্বে পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও কঠিন কর্তব্য পালন করতে হয়। সর্বক্ষেত্রে তারা দক্ষতার ছাপ রাখছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মায়ের কাছে সন্তান যে শিক্ষা লাভ করে তাই পরবর্তী জীবনে তার চরিত্র গঠনে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। সেজন্য মায়ের নিকট হতে শেখা উপযুক্ত শিক্ষার গুরুত্ব ও অবদান অপরিসীম। এছাড়া সংসারে সুখ-সমৃদ্ধি ও উন্নতির ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকার কোনো বিকল্প নেই। কথায় আছে, "সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।"

নারী ও পুরুষের সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টায় সৃষ্ট এ সমাজের উন্নতি এবং প্রগতির জন্য নারীরা সমান অংশীদার। তাই যাবতীয় উন্নয়নমূলক কার্যে নারীদের সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

২০. পরের অনিষ্ট চিন্তা করে যেই জন নিজের অনিষ্ট বীজ করে সে বপন।

[ঢা. বো. ১৪; রা. বো. '১৭, '১৫, '১৩; কু. বো. '১৯, '১৩, '০৭; চ. বো. '০১; সি. বো. '০৬; ব. বো, '১২, '০৮, '০৪; দি. বো, '২০, '১৯, '১৭] [ইবনে তাইমিয়া স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা]

ভাব-সম্প্রসারণ: অন্যের ক্ষতি করার চিন্তা-ভাবনা করলে পরিণামে নিজেরই ক্ষতি সাধিত হয়। তাই পরের ক্ষতির চিন্তা থেকে দূরে থাকা সকলের কর্তব্য।

সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন-এর সৃষ্ট সকল মানুষের যাবতীয় কর্ম প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হলো সুখে-শান্তিতে ও আরামে থাকা। এ দুনিয়ায় কত রকমের মানুষ দেখা যায়। কেউ নিজের সবকিছু দিয়ে, এমন কী প্রাণ দিয়েও পরের উপকার করে। আবার এমন লোকও আছে, যারা পরের ভালো তো করেই না বরং কী করে সর্বনাশ করা যাবে সেই চিন্তায় সব সময় মশগুল থাকে। এ ধরনের মানুষ নেহায়েতই অমানুষ। তাদের অনিষ্ট আচরণে শুধু সেই নয়, সাথে ব্যক্তি ও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়:

"যারে তুমি নিচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিছে যে নিচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

উল্লিখিত উক্তিটির মূলকথা হলো- যে নিজের উপকার হবে ভেবে অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা চালায়, মূলত সে নিজেই তার নিজের ক্ষতি করে।

পৃথিবীতে মহাপুরুষগণের জীবনী পাঠে দেখা যায়, তাঁরা সমগ্র জীবন মানুষের কল্যাণ সাধনে বিলিয়ে দিয়েছেন। মহানবী হযরত মুহম্মদ (স)-এর চলার পথে এক বৃদ্ধা বিদ্বেষবশত প্রতি দিন কাঁটা বিছিয়ে রাখত। মহানবী (স) কাঁটার আঘাতে কষ্ট পেলেও বৃদ্ধাকে কোনোদিন গালমন্দ করেন নি। একদিন হযরত মুহম্মদ (স) তাঁর চলার পথে কাঁটা দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হন এবং খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে, যে বৃদ্ধা এই কাজ করত সে ভীষণ অসুস্থ। মহানবী হযরত মুহম্মদ (স) তৎক্ষণাৎ বুড়িকে দেখার উদ্দেশ্যে বাড়িতে পৌঁছেন এবং তার অসুখের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করেন। এতে সেই বৃদ্ধা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে যায়। সে উপলব্ধি করতে পারে, পরের অনিষ্ট চিন্তা ও কাজের মধ্যে কোনো মঙ্গল নেই। বরং এরূপ পরের অনিষ্ট চিন্তা ও কাজ নিজের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে। পরের অনিষ্ট করতে গিয়ে বহু লোক নিজেদের জীবনকেই ধ্বংস করেছে। এর বহু নজির ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। এ বিচিত্র জগতে মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থোদ্ধারে এত অন্ধ হয়ে পড়ে যে, পরের অমঙ্গল ও অনিষ্ট করতে গিয়ে স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে এবং পরিণামে নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনে।

কখনোই অপরের কোনো অকল্যাণ চিন্তা করা যাবে না। এসব পরিহার করে বরং পরের স্বার্থে নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিতে হবে। তবেই জীবন সার্থক এবং সুন্দর হবে।

২১. যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।

[রা. বো, '১৯, '০৫; ব. বো. ১৯]

ভাব-সম্প্রসারণ: ছোট এবং নগণ্য ভেবে কোনো বস্তুকে অবহেলা করা ঠিক নয়। কারণ এসব অতি ক্ষুদ্র জিনিসের মধ্যেও মহামূল্যবান রত্ন থাকতে পারে। সেজন্য বস্তুর আকার, আয়তন যাই হোক না কেন তা তাচ্ছিল্য না করে বরং গবেষণাপূর্বক এর বিস্ময়কর সম্ভাবনা খুঁজে বের করা উচিত।

এ পৃথিবীতে কোনো জিনিসকেই তুচ্ছ বলে অবহেলা ও অবজ্ঞা করা উচিত নয়। বাইরের আকৃতি ও প্রকৃতি দেখে কখনো কোনো জিনিসের প্রকৃতি ও সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। রাস্তার পাশে পড়ে থাকা এক টুকরো কাগজের মধ্যে হয়ত এমন উপদেশ থাকতে পাঁরে যার দ্বারা তোমার জীবন স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে। সৃষ্টিকর্তা এ দুনিয়াকে বিভিন্ন জিনিসের সমন্বয়ে শোভিত করেছেন। সঠিকভাবে অনুসন্ধান ও অনুধাবন করতে পারলে অনেক তুচ্ছ ও নগণ্য জিনিসের মধ্যেও মহামূল্যবান রত্নের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। "ওকি চণ্ডাল! চমকাও কেন? নহে ও ঘৃণ্য জীব-
ওই হতে পারে হরিশচন্দ্র, ওই শশ্মশানের শিব।" (সাম্যবাদী, কাজী নজরুল ইসলাম)

আমরা কোনো মানুষের পোশাক পরিচ্ছদ, বংশমর্যাদা ও শিক্ষাদীক্ষা দেয়ে তার মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করি। সাধারণ পোশাক পরিহিত গরিব, দীনহীন মানুষকে বা দারিদ্র্যের অনাদরে লালিত মানুষদের আমরা মূল্য দিতে চাই না। কিন্তু এমনও হতে পারে, ঐ দীনহীন মানুষটির মন মানবতাবোধ ও উদারতায় ভরপুর। এক নিচু বংশের দরিদ্র মানুষও এ বিশ্বে রেখে যেতে পারে এমন এক অবদান যা বিশ্বমানবতার পরম উপকারে আসবে; এমন নজির বিরল নয়।

পৃথিবীর বহু দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষ রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন শাখায় অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। এ প্রসঙ্গে ড. লুৎফর রহমান বলেন, "মানুষ যতই ছোট হোক, যতই সে অজ্ঞাত হয়ে থাকুক তার মধ্যে অসীম ক্ষমতা, অনন্ত প্রতিভা' ঘুমিয়ে আছে। অনুকূল পরিবেশ পেলে তার ভিতরকার রূপ ও মহিমা অনন্ত শিখায় ফুটে উঠবে।" হীন ও তুচ্ছ বলে কাউকে অবহেলা করা উচিত নয়। ঝিনুক একটি সাধারণ বস্তু। এমন কোনো বিশেষ প্রয়োজনে তা আসে না এবং সেজন্য তা সযত্নে রক্ষিতও হয় না। অথচ মুক্তা জাতীয় অতি মূল্যবান রত্নটি ঐ ঝিনুকের মধ্যেই পাওয়া যায়। বহু অনুসন্ধান করেই এসব বহু মুল্যবান রত্নরাজি বের করতে হয়।

কোনো বস্তু আকারে ছোট হলেও তাকে তুচ্ছ করতে হবে তা নয়- কারণ স্মরণ রাখতে হবে যে অতি নগণ্য এবং ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যেও মূল্যবান রত্নরাজি থেকে যেতে পারে।

২২. নানান দেশের নানান ভাষা

বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা?

[রা. বো, '০৯; চ. বো, '১৩, '০৫; সি. বো. '১৭; ব. বো. '২২, '১৩; ম. বো, '২০]

ভাব-সম্প্রসারণ: মাতৃভাষা মানুষের জন্মগত অধিকার এবং এ ভাষায় সে সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি লাভ করে। বিশ্বজুড়ে হাজারও ভাষা প্রচলিত থাকলেও মায়ের ভাষায় তথা স্বদেশি ভাষায় যে কী তৃপ্তি, কী সুখ তা কেবল উপলব্ধিযোগ্য। আশা আকাঙ্ক্ষার সঠিক বহিঃপ্রকাশ কেবল মাতৃভাষাতেই সম্ভব।

মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী। তারা চিন্তা ভাবনা অন্যের কাছে পৌঁছে দেয় ভাষার মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন, 'আলো দিয়ে আলো জ্বালা'। এভাবে পূর্ববর্তী মানুষের ভাব ভাবনা ভাষায় লিখিত রূপের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে যায়। এভাবেই একের জ্ঞান অন্যে উপলব্ধি করে করে গড়ে তুলেছে সভ্যতা। পৃথিবীতে এক দেশের মানুষের সাথে অন্য দেশের মানুষের চেহারার যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি ভাষারও রয়েছে পার্থক্য। নানান ধরনের চেহারার মতো পৃথিবীতে রয়েছে নানান জাতির মানুষের নানান ভাষা। একেক দেশের মানুষ একেক ভাষা ব্যবহার করে। মানুষ যে দেশে জন্মগ্রহণ করে এবং মাতাপিতা যে ভাষা ব্যবহার করে, সেটাই সাধারণত তার মাতৃভাষা। মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিশুর বিকাশ সহজ ও সরল হয়। মাতৃভাষার মাধ্যমেই মানুষ সমস্ত জ্ঞানের বিষয় সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করে এবং প্রকাশে সক্ষম। আমরা মাতৃভাষার সাথে সাথে অন্য ভাষাও আয়ত্ত করি। কিন্তু অন্য ভাষায় কিছু বুঝতে হলেও মাতৃভাষার মাধ্যমেই করে থাকি। মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা, অবহেলা করে কেউ কোনোদিন তার প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে না। আমাদের মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে অন্য ভাষায় তথা 'বিনা স্বদেশি ভাষা'-য় সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে পেয়েছেন প্রতি পদে পদে আঘাত, দুঃখ, কষ্ট। শেষ পর্যন্ত মা সম মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখেছেন 'বঙ্গভাষা', 'কপোতাক্ষ নদ'। যা তাঁকে অমর করে রাখল। মূলত মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষাতে আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায় না তার বাস্তব প্রমাণ রেখে গেলেন মহাকবি মধুসূদন। এ মায়ের ভাষাকে রক্ষা করার জন্য বাংলার মানুষ রক্ত দিয়েছে, উৎসর্গ করেছে জীবন।

যারা দেশ ছেড়ে বিদেশে থাকে, বিদেশি ভাষায় কথা বলে কাজ চালালেও, তাদের আত্মতৃপ্তি ঘটে স্বদেশি ভাষাভাষীর সাথে কথা বলে। তাছাড়া আত্মবিকাশে মাতৃভাষার কোনো বিকল্প নেই। মিল্টন পাহাড়ি ঝর্নার কলধ্বনিতে মাতৃভাষার সুর শুনতে পেতেন। মাতৃভাষা মানবজীবনে, জাতীয় জীবনে এত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আমরা মাতৃভাষার জন্য রক্ত দিয়েছি। সর্বোপরি একটি মানুষ নানা ভাষায় পণ্ডিত হলেও, কেবল মাতৃভাষাতেই সে পরিতৃপ্ত হয়, মাতৃভাষার মাধ্যমেই ঘটে তার পূর্ণ বিকাশ।

মা ও মাতৃভূমি যেমন সবচেয়ে প্রিয়, তেমনি মাতৃভাষা অর্থাৎ স্বদেশি ভাষাও প্রত্যেকের সমান প্রিয়। কারণ মাতৃভাষাই মনের ভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। তাই প্রত্যেক জাতির কাছেই তার মাতৃভাষা মহামূল্যবান।

২৩. গ্রন্থগত বিদ্যা আর পরহস্তে ধন

নহে বিদ্যা, নহে ধন হলে প্রয়োজন।

[ঢা. বো. '০১; রা. বো. '০১; চ. বো. '২২, '১৬; সি. বো. '১৫, '১৪, '০৯, ০৫; ব. বো. '০৯, '০৬; দি. বো. '২২, '১৬] [সারদাসুন্দরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদপুর; হরিমোহন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জঃ কুমিল্লা জিলা স্কুল, কুমিল্লা; চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্তঃবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর; দিনাজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, দিনাজপুর]

ভাব-সম্প্রসারণ: গ্রন্থগত বিদ্যা এবং পরের হাতের ধন-সম্পদ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের অর্জনে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তা কোনো কাজে আসে. না। অর্থাৎ বইয়ের বিদ্যা যা আত্মস্থ হয় নি এবং পরের অধীন সম্পদ যা নিজের আয়ত্তে আসে নি- এ দুটিই সমান। কারণ প্রয়োজনের সময় এ সম্পদ কোনো কাজে ব্যবহার করা যায় না।

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। তার বিবেক আছে। মানুষ জ্ঞান অর্জন করে মহৎ গুণাবলির অধিকারী হয়। পরিশ্রম ও বুদ্ধি দিয়ে সে অর্থ উপার্জন করে। জ্ঞান ও অর্থ মানুষের মনুষ্যত্বকে পূর্ণতা দেয়। জ্ঞান অর্জন করতে হলে তাকে পড়াশুনা করতে হয়। গ্রন্থ বা বই জ্ঞানের ভান্ডার। এ গ্রন্থ পাঠ করে অন্য মানুষ তার জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করতে পারে। জ্ঞানের ধারক ও বাহক হচ্ছে বই। গ্রন্থে আবদ্ধ মননের সোনালি শস্যের স্বাদ পেতে হলে আমাদেরকে বই পড়তেই হবে। কিন্তু বই হৃদয়ঙ্গম না করে কেবল প্রচুর বই সংগ্রহে রাখলেই তাকে জ্ঞানী বলা যায় না। কারণ ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের প্রয়োজন দেখা দিলে গ্রন্থগত সে বিদ্যা কোনো কাজেই আসে না। কেবল মুখস্থ করে পরীক্ষা পাস করলেই প্রকৃত শিক্ষিত হতে পারে না। যদি গ্রন্থের আদর্শকে আত্মস্থ করা না যায়, তাহলে তা জীবনের কোনো উপকারেই আসে না। বিদ্যার পোশাকীরূপে দেহশোভিত করলেই যথার্থ বিদ্বান হওয়া যায় না। যেমন নিজের ধন অন্যের কাছে থাকলে প্রয়োজনের সময় উপকারে আসে না। বিদ্যা ও ধন মানুষের অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। তাদের কাজে লাগাতে হলে বিদ্যাকে করতে হয় আত্মস্থ আর ধনকে রাখতে হয় নিজের আয়ত্তে। সে জন্যেই বলা হয়েছে, পুঁথিগত বিদ্যা যেমন নিষ্প্রয়োজন, তেমনি পরহস্তের ধনও নিরর্থক।

বই জ্ঞান অর্জনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম এটা যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য বই থেকে আহরিত জ্ঞানকে কাজে লাগাতে ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় এবং ধন-সম্পদ নিষ্ঠার সঙ্গে আপন আয়ত্তে আনতে হবে। তাহলেই তা প্রয়োজনে কাজে লাগবে।

২৪. যে জাতি জীবন হারা অচল অসার,
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।

[য. বো. '২০; ব. বো. '০৫] [বগুড়া জিলা স্কুল, বগুড়া; পাবনা জিলা স্কুল, পাবনা; মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর; নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম; বু-বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

ভাব-সম্প্রসারণ: যে জাতি গতিহীন, সে জাতি যেন জড় পদার্থের মতো। জাতিকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তুলতে হলে গতিশীল চেতনা ও আদর্শ দরকার।

জীবনে গতি না থাকলে জীবনের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। গতি বা পরিবর্তন জীবনের লক্ষণ। গতির যে পরিবর্তন আসে তাতে জীবনকে বোঝা যায় নতুনভাবে, তাতে জীবনের নতুন পরিচয় ফুটে ওঠে। এ গতির ফলে অতীতের পুরনো বৈশিষ্ট্য ফেলে নতুন রূপ দেখা দেয়।

নদীর গতিতেও সে বৈশিষ্ট্য বর্তমান। নদীর পরিচয় তার গতির মধ্যে, স্রোতের মধ্যে। যদি গতি হারিয়ে নদী এক জায়গায় আটকে যায়, তবে তাকে আর নদী বলা যায় না। তখন তার নাম নদী নয়, বন্ধ জলাশয় হিসেবে তার পরিচয়; শৈবালে সে জঙ্গলপূর্ণ হয়। তেমনি যদি কোনো কারণে জাতির চলার ছন্দ ব্যাহত হয়, তাহলে সে জাতি তার স্বাভাবিক বিকাশ হারিয়ে বিকৃতরূপ পরিগ্রহ করে। জাতির গতিবেগ যদি থেমে যায় তাহলে জীর্ণ লোকাচার এবং নানা ধরনের কুসংস্কার দ্বারা জাতি বিকারগ্রস্ত হয়। প্রত্যেক জাতিরই থাকে একটি স্বাভাবিক গতি। কোনো জাতি যদি সেই গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে, তাহলে জাতীয় জীবনে দেখা দেয় অবাঞ্ছিত জড়তা। এ জড়তা জাতীয় জীবনের প্রধান অন্তরায়। কালক্রমে এখান থেকেই নানা ধরনের প্রকৃতি ও পতনের জন্ম নেয়। সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশাচার ও লোকাচারের আবর্জনা-স্তূপ সে জাতির জীবনধারাকে পঙ্গু ও নিশ্চল করে দেয়। তখনই জাতীয় জীবনে কুসংস্কার মহামারী আকার ধারন করে। জাতি হাতে পায়ে পরে নানা ধরনের বিধি নিষেধের শিকল। নিষ্ঠুরভাবে পরাধীনতা হাতছানি দেয়। তাই জীর্ণ লোকাচার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য গতিশীল জীবন একান্ত প্রয়োজন। এক কথায় গতিই জীবন। স্থবিরতা মানে মৃত্যু। সনাতন ধ্যানধারণা এবং কূপমন্ডুকতা জাতির উন্নতির পথে বিরাট অন্তরায়। এ ধারণা নিয়ে জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। তখন পুরনো দিনের নানা সংস্কার জীবনকে জড়ায়, থাকে না জীবনের কোন বিকাশ। জাতি হিসেবে তখন তার এগিয়ে যাওয়ার কোনো নিদর্শন থাকে না।

গতিশীল জীবন প্রবাহ জাতীয় জীবনকে প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল করে। যে জাতির জীবনধারা অচল সে জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী। গতিশীল জীবন প্রবাহই জাতীয় জীবনকে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে।

২৫. শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির
লিখে রেখো এক ফোঁটা দিলেম শিশির।

[ঢা. বো. '১৭, '১১, '০৩; য. বো, '১৩; কু. বো. ২০০০; চ. বো. '১৯, '১৫, '০৪; ব. বো. '১৭] [হলি ক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা: ইসলামি এডুকেশনাল ট্রাস্ট (আইইটি) সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী]

ভাব-সম্প্রসারণ: অকৃতজ্ঞরা চিরকালই কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে অহংকারবোধ করে।

শৈবাল এক প্রকারের সালোকসংশ্লেষণকারী জলজ উদ্ভিদ। দিঘির অথৈ জলে এর জন্ম ও পরিবৃদ্ধি হয়।

দিঘি থেকেই এটি আহার্য সংগ্রহ করে। মোটকথা এর অস্তিত্ব দিঘির ওপর নির্ভরশীল। শৈবাল এক প্রকারের সালোকসংশ্লেষণকারী জলজ উদ্ভিদ। দিঘির অথৈ জলে এর জন্ম ও পরিবৃদ্ধি হয়। দিঘি থেকেই এটি আহার্য সংগ্রহ করে। মোটকথা এর অস্তিত্ব দিঘির ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং দিঘির প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ থাকা শৈবালের নৈতিক দায়িত্ব। পরনির্ভরশীল শৈবালের গায়ে কিছু শিশির বিন্দু জমা হয় এবং বাস্তুতাড়িত হয়ে সেই শিশির বিন্দু গড়িয়ে পড়ল দিঘির জলে। সাথে সাথে নির্লজ্জের ন্যায় সদম্ভে সে দিঘির দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক ব্যাপারটি স্মরণ রাখার জন্য ইঙ্গিত দিল। আশ্চর্যই বটে। দিঘির পানিতে যার জন্ম, স্থিতি ও লয়। তারই নাকি এমন দম্ভ, এত ঔদ্ধত্য এক ফোঁটা পানি দান করেছে বলে। পৃথিবীতে শৈবালের মতো এক শ্রেণির মানুষ আছে, যারা পরের অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে অথচ ঋণ স্বীকার করে না। উপরন্তু কোনো কারণে যদি একটু কিছু উপকার করতে পারে বা তাদের মারফত কোনো উপকারের ফল অন্য কোথা থেকে আসে, তাহলে তারা তা সরবে প্রকাশ করে। পরের খেয়েপরে বেঁচে থেকে পরের ওপর বাহাদুরি দেখাতে তারা লজ্জাবোধ করে না। এ ধরনের লোক অহংকারী ও অকৃতজ্ঞ। তাদের অহংকার আকাশ ছোঁয়া, আত্মপ্রচারে মোহগ্রস্ত হয়ে বোকার মতো তারা নিজের ঢাক নিজে পেটায় অথচ তাদের সামান্য দানে পৃথিবীর কোন উপকারই হয় না। প্রত্যেকেরই উচিত যার দ্বারা সে কোনো না কোনোভাবে উপকৃত হয় তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক কৃতজ্ঞতাবোধ প্রকাশ করা। কেননা, অকৃতজ্ঞ লোকদের স্বয়ং আল্লাহও পছন্দ করেন না।

অকৃতজ্ঞরা নুন খায় কিন্তু গুণ গায় না। তাই তো সমাজ থেকে উপকার করার মানসিকতা উঠে যাচ্ছে। একথা প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত কৃতজ্ঞতাই পরম ধর্ম।

২৬. বিশ্রাম কাজের অঙ্গ একসাথে গাঁথা
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা।

[য. বো. ১৫, ১০, '০৭; কু. বো. '২০; সি. বো. '০৩; ব. বো. '০২; দি. বো, '১২]

ভাব-সম্প্রসারণ: চোখকে নিরোগ সুস্থ রাখতে চোখের পাতার যেমন বিকল্প নেই। তেমনি কাজকে সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে বিশ্রামের প্রয়োজন। কারণ বিশ্রামে শরীরে যে উদ্যম আসে, তা দিয়েই কাজ সম্পন্ন করতে হয়। কর্মময় এ পৃথিবী। এখানে প্রতিটি প্রাণীই শ্রম দিয়ে জীবন বাঁচিয়ে রাখে। পৃথিবীর মানুষ আপন শ্রমের বিনিময়েই পৃথিবীকে নতুন রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে। আজকের নতুন সভ্যতা মানুষের বুদ্ধি, কৌশল ও শ্রমের ফসল। কিন্তু শ্রম নিরবচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না। জীবনে যেমন কর্মের প্রয়োজন আছে তেমনি আছে বিশ্রামের। চোখের পাতা যেমন চোখের অংশ, বিশ্রামও তেমনি কাজের অংশ। সৃষ্টিকর্তা মানুষকে কর্মের জন্যে দিন ও বিশ্রামের জন্য রাত দান করেছেন। পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি। কাজেই দেশ, দশ ও বিশ্বকে উন্নত করার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করা আশু দরকার। আজ বিজ্ঞানের চরম ও পরম উন্নতির যুগে জাপানিরা পরিশ্রমী হবার কারণেই টেক্নোলজির দিক থেকে আমেরিকা ও রাশিয়াকে পেছনে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তাদের পরিমিত বিশ্রাম করার প্রবণতা না থাকায় আজ তাঁরা অনিদ্রায় ভুগছে। এমন অনিদ্রা মানুষকে এক সময় অসুস্থ করে তুলতে পারে। পরে স্লিপিং টেবলেট খেয়েও ঘুম আনতে পারে না। উন্নত দেশগুলো এ রোগে ভুগছে। তাই ইসলামও বলে "তোমাদের উচিত দৈনিক ছয় ঘণ্টা ঘুম দেওয়া" পাখি, জীব-জানোয়ার, কীট- পতঙ্গ খাদ্যের অন্বেষণে বাসা থেকে বের হয় ও পেট ভরে গেলে পুনরায় ফিরে আসে বাসায় বিশ্রাম নিতে। বিশ্রামে শরীরের দুর্বলতা দূর হয়, মানুষ নবশক্তি লাভ করে, মন সতেজ ও প্রফুল্ল হয়।

তাই শুধু কর্ম নয়, বিশ্রাম বা ছুটিও জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক।

মানুষের জীবনে কর্মশক্তি বাড়াবার জন্যই ছুটির দরকার।

বিশ্রাম ও পরিশ্রম একে অপরের পরিপূরক। যেমন চোখ ও চোখের পাতা, দিন ও রাত। তাই পরিশ্রমের পর বিশ্রাম অতঃপর পরিশ্রম এ ধারায় কাজের অগ্রগতি হয়।

২৭. আলো বলে, 'অন্ধকার, তুই বড় কালো।' অন্ধকার বলে, 'ভাই, তাই তুমি আলো'।

[য. বো. '১৬; সি. বো, '১৬, '০২; ব. বো. '১০; ম. বো, '২২]

ভাব-সম্প্রসারণ: যেকোনো জিনিসের ভালো এবং মন্দ দুটো দিক আছে। আর এটা আছে বলেই একটি আরেকটির চেয়ে মহান এবং উপভোগ্য।

অবিমিশ্র সুখ, আনন্দ বা সৌন্দর্য জগতের নিয়ম নয়। এদের পাশাপাশি রয়েছে দুঃখ- দৈন্য, ব্যথা-বেদনা, শোক-তাপ ও মালিন্য- কুশ্রীতা। বৈচিত্র্যের অপূর্ব সমাবেশেই জীবন এবং জগৎ গড়ে উঠেছে। আমরা অনেক সময় ভুলে যাই যে, দুঃখ আছে বলেই সুখ এত মহান, এত মধুর। দুঃখ ও সুখ পাশাপাশি অবস্থান করে। দুঃখের পরে সুখ আসে, সুখের পরে দুঃখ জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বঞ্চনাই প্রেমকে স্বর্গীয় সুধা দান করে। যদি এমন হতো যে, পৃথিবীতে কখনো সূর্য অস্ত যাবে না, অহোরাত্র সূর্যালোকে চারদিক আলোকিত থাকবে, তাহলে তার কি কোনো মূল্য থাকত? অন্ধকার এসে দিবালোককে গ্রাস করে বলেই পরদিন প্রভাতের সোনালি অরুণোদয় এমন করে আমাদের সকলের চিত্ত হরণ করে। আঁধার আছে বলেই দিনের আলো বৈচিত্র্যহীন, বৈশিষ্ট্যহীন হয়ে পড়ে না। যদি অভাববোধ না থাকত তবে মানবপ্রগতি বহুকাল আগেই থেমে যেত। অতৃপ্তি না থাকলে জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎকর্ষ ঘটে না। মহৎ বেদনা না থাকলে মহৎ কাজ কোনো দিনই সৃষ্টি হতে পারত না। আলোর রূপ ও সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য যেমন অন্ধকার প্রয়োজন। তেমনি দুঃখ-বেদনার উপস্থিতির জন্যই জীবনে সুখ আনন্দ এত কাম্য। সব জীবন যদি অটুট সুখ- আনন্দে পূর্ণ হয়; তাহলে সুখ-আনন্দের কোনো অনুভূতিই থাকে না। দুঃখ আছে বলেই সুখ এত বাঞ্ছনীয়। মনে রাখা উচিত যে, আঘাতই সান্ত্বনাকে মধুর করে তোলে। বঞ্চনাই স্বর্গীয় সুধা দান করে। যদি এমন হতো যে, কখনো সূর্য অস্ত যেত না, সারারাত্র সূর্যালোকে পৃথিবী প্লাবিত থাকত, তা হলে তার কি কোনো মূল্য থাকত? তাই আলোর রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য যেমন অন্ধকার একান্ত অপরিহার্য, তদুপ দুঃখ, বেদনা ও অভাবের তীব্র জ্বালা আছে বলেই আমাদের জীবনে সুখ, আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য এত কাম্য। তাই কবি বলেন-

"দুঃখ তুমি পরম মঙ্গল
তোমারি দহনে আমি হয়েছি উজ্জ্বল।"- (কুমুদরঞ্জন মল্লিক)

প্রকৃতপক্ষে জগতে যদি বৈচিত্র্য না থাকত তাহলে সুখ-দুঃখ, আনন্দ- বেদনা ইত্যাদি অনুভূতির কোনো অস্তিত্বই থাকত না। তাই এ জগতে কোনো কিছুই মূল্যহীন নয়। আলো ও অন্ধকার, সুখ ও দুঃখ, সৌন্দর্য ও কদর্যতা একে অপরের পরিপূরক। '

অসুন্দরের জন্যই সুন্দরকে, অভাব-অপ্রাপ্তির জন্যই প্রাপ্তিকে আমাদের এত ভালো লাগে, তেমনি অন্ধকারের কারণেই আলো সত্য হয়ে ওঠে।

২৮. "কত বড় আমি," কহে নকল হীরাটি; তাইতো সন্দেহ করি, "নহ ঠিক খাঁটি।"

[রা. বো. '০২; চ. বো. '০৬; ব. বো, '২০, '১৫]

ভাব-সম্প্রসারণ: মিথ্যার উপর যাদের 'ভিত গড়া তারা তাদের সে মিথ্যাকে ঢাকতে, নিজেকে বড় বলে প্রকাশ করতে সর্বদা ব্যস্ত থাকে। কিন্তু যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী এবং বিজ্ঞ তাঁরা হন প্রচারবিমুখ। সচেতন ব্যক্তিরা তাই মিথ্যার জাহির দেখে মুখ টিপে হাসেন।

মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বাস করে। মানুষের মাঝে ভালো-খারাপ দু'প্রকারই সমাজে বাস করে। সমাজ বা মানুষের কল্যাণ কামনা করা ভালো মানুষের লক্ষণ। তিনি সবসময় চিন্তা করেন মানুষের শুভ কামনা। অথচ তিনি তা প্রকাশ করতে চান না। তাঁর প্রশংসা মানুষের মুখে প্রকাশ পায়। আর খারাপ লোক সব সময় মানুষের মন্দ, সমাজের মন্দ করার চিন্তাভাবনা করে। আর প্রকাশ করতে থাকে আমি মানুষের সমাজের ভালো কাজ করছি। এটা আসলে ঘৃণিত। সমাজের মাঝে যিনি ভালো কাজ করেন তার প্রকাশ মানুষের মুখে মুখে। খারাপ লোক নিজেকে প্রকাশ করতে উন্মুখ হয়ে থাকে। কীভাবে নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করতে পারবে তার জন্য চেষ্টা করতে থাকে। যেমন নকল হীরা নিজেকে খাঁটি বলে বেড়ায়। আর এর জন্য খাঁটি হীরা নিজেকে খাঁটি বলতে কুণ্ঠাবোধ করে। কারণ নকল এর অস্তিত্ব আছে। খারাপ আছে বলে ভালোর দাম আছে। মন্দ না থাকলে আমরা ভালোর মর্ম বুঝতে পারতাম না। মন্দের বা খারাপের বড়াইই ভালোর দাম। সত্যিকার ভালো কখনো নিজেকে নিয়ে বড়াই করে না। মানুষ তার গুণগান করে।

ভরা কলস যেমন শব্দ করে বাজে না, তেমনি যাঁদের দানে সভ্যতার বিকাশ তাঁরা কখনো তাঁদের মহিমা প্রচার করেন না। আর খালি কলস যেমন বেশি বাজে তেমনি গুণহীন ব্যক্তি নিজের ঢোল নিজে পিটিয়েই হয়রান হয় কেউ তা শোনে না বরং কানে তুলা দিয়ে রাখে দূষণ থেকে বাঁচতে।

২৯. অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

[ঢা. বো. '১৬, '০৬; রা. বো, '২০; রা. বো. '২০; য. বো. '১৯; কু. বো. '১১; ব. বো. '১৬] [এন কে এম হাইস্কুল এন্ড হোমস, নরসিংদী: মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, মিরপুর, ঢাকা; বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া: রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী; নাটোর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, নাটোর; নওগাঁ জিলা স্কুল, নওগাঁ: কুমিলা মডার্ন হাই স্কুল, কুমিল্লা; ফেনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ফেনী গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, কুমিল্লা: চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম; ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; বরগুনা জিলা স্কুল, বরগুনা: রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর; দি মিলেনিয়াম স্টারস স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর পুলিশ লাইনস স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর: গাইবান্ধা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গাইবান্ধা]

ভাব-সম্প্রসারণ: অন্যায়কারী ও অন্যায়ে সাহায্যকারী বা সহ্যকারী উভয়েই সমান দোষী। মানুষের যেমন মানুষ হিসেবে কতকগুলো অধিকার আছে তেমনি মানুষ হিসেবে তার কতকগুলো দায়িত্বও রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েই অধিকার অর্জিত হয়। অন্যায় না করা ও অন্যায় না সহা, এ দুটিই মনুষ্যত্বের দায়িত্ব। আমার অধিকার ততক্ষণ, যতক্ষণ অন্যেরও ঠিক সেই অধিকারে আমি হস্তক্ষেপ না করি, করলে তা অন্যায় হবে। অন্যায় কাজের দ্বারা মানুষের ক্ষতি সাধিত হয়। তাই অন্যায়কারী শাস্তির যোগ্য অপরাধী।

ক্ষমা মহৎ গুণ হলেও সব ধরনের অন্যায়ের ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রদর্শন সমীচীন নয়। কারণ অন্যায়কারীর উপযুক্ত বিচার না হলে সমাজে অন্যায় কাজের প্রভাব বেড়ে গিয়ে সমাজকে অপরাধের আখড়ায় পরিণত' করবে। ফলে সমাজ হয়ে উঠবে অন্যায়, অপরাধের লীলাক্ষেত্র এবং মনুষ্য বসবাসের অনুপযোগী। তাই সর্বজনীন কল্যাণ নিশ্চিত করার স্বার্থে অন্যায়কারীকে সাজা দেয়া উচিত। কোনো অবস্থাতেই বিনা বিচারে তাকে ক্ষমা করা উচিত নয়। ক্ষমা দুর্বলতার পরিচায়ক, অন্যায়ের শামিল, অনুরূপ ক্ষমা বাঞ্ছনীয় নয়। তাই যে অন্যায় করে এবং যে সহ্য করে উভয়ই ঘৃণাযোগ্য। প্রতিবাদ, প্রতিরোধের মাধ্যমে অন্যায়কে রুখতে হবে। তবেই সমাজে সুদ্ধ পরিবেশ ফিরে আসবে। অন্যায়কারী ও অন্যায় সহ্যকারী উভয়কে তাই শাস্তি দেয়া প্রয়োজন। অন্যায়ের প্রতিকার করতে শুধু অন্যায়কারীকে শাস্তি দিলেই হবে না, তাকে প্ররোচনাকারী ও অন্যায় সহ্যকারী সকলকেই একই সাথে শাস্তি দিতে হবে।

৩০. সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

[ঢা. বো. '২০, '১৯; য. বো, '২২, '১৭, '১২, '০৬; সি. বো. ২২. '২০; দি. বো. ১৫] [মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা; আল-আমিন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ, চাঁদপুর]

ভাব-সম্প্রদারণ: জীবনকে যখন অপরের জন্য বিলিয়ে দেওয়া হয়, এ জীবন তখনই সার্থক হয়। মানুষ সুখের পিয়াসী। পৃথিবীতে সে সুখী হতে চায়। তার সমস্ত প্রয়াস, সমস্ত সাধনা সুখেরই জন্য; কিন্তু সে সুখ প্রকৃত সুখ নয়। তাই দেখা যায় যে, আত্মসুখ সন্ধানী মানুষ দেহসর্বস্ব পশুতে পরিণত হয়। কেবল নিজের সুখের জন্য লালায়িত মানুষ সুখ পায় না। স্বার্থপরতার চার দেয়ালের মধ্যে নেই প্রকৃত সুখের সন্ধান। নিজের চারদিকে স্বার্থপরতার এমন কঠোর আবরণ তৈরি করে তার মধ্যে বাস করলে বাইরের বিশাল বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হয়। কেবল ক্ষুদ্র 'আমিই' এ পৃথিবীর সব নয়। বাইরে রয়েছে মানুষের সমাজ, রয়েছে মানুষের বৃহৎ পৃথিবী। তাদের বাদ দিয়ে কিংবা তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা বাঁচতে পারি না।

বলা হয়-

"স্বার্থমগ্ন যেজন, বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে,
সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।"

আমরা সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়েই আমরা মিলে মিশে বসবাস করছি। এ পৃথিবীতে এককভাবে কেউ আমরা পরিপূর্ণ নই। প্রতিটি মানুষ পরস্পর নির্ভরশীল। জীবনকে গতিময়, সুন্দর ও সার্থক করে গড়ে তোলার জন্য অপরের সাহায্য অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের নিকট ব্যক্তিস্বার্থই সবার উর্ধ্বে। অন্যের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে আমরা চাই না। মানুষ সামাজিক জীব, সকলের মঙ্গল পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এককভাবে কেউ তা কামনা করতে পারে না। এ পৃথিবীতে মহৎ ও সজ্জন ব্যক্তিরা সদা পরহিতে আত্মদান করে গেছেন। এভাবেই তাঁরা হয়েছেন স্মরণীয় ও বরণীয়। যদি অপরের সুখ-দুঃখের কথা চিন্তা না করে মানুষ কেবল নিজের সুখ সুবিধার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে তবে কারও মঙ্গল হতে পারে না। অপরের মঙ্গল করার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। ত্যাগই আজ পৃথিবীকে এমন সুন্দর ও সুখের করে তুলেছে। এ পৃথিবীতে প্রত্যেক মহৎ ব্যক্তিই পরের উপকারের জন্য জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। পশুরাই কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। মানুষ পশুর মতো স্বার্থপর নয়। নিজের স্বার্থের কথা না ভেবে পরের মঙ্গল চিন্তায় জীবন উৎসর্গ করাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

বস্তুত অন্যের মঙ্গল কামনার মধ্যে নিজেরও কল্যাণ নিহিত। আমি যদি অন্যের মঙ্গল চাই, সেও আমার মঙ্গল চাইবে। এভাবে পারস্পরিক সহমর্মিতা দ্বারা আমরা শান্তির পৃথিবী গড়তে পারি।
অপরের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার শরীক হওয়াই তো মনুষ্যত্বের পরিচয় এবং এতেই পাওয়া যায় নিবিড় আনন্দ। পরার্থে জীবনকে বিলিয়ে দিলেই কেবল জীবনের পূর্ণতা আসে; জীবন সার্থক, সুন্দর এবং খাঁটি হয়।

৩১. যে সহে, সে রহে।

[ঢা. বো, '০৮; রা. বো, '০৩; য. বো. '১৪; চ. বো, '১৫, '১৩ ব. বো, '৩৬, '০৩] [নোয়াখালি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; যু-বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট: বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ]

ভাব-সম্প্রসারণ: বৈরী শক্তির সাথে যুদ্ধে আঘাত পেয়েও যে সহ্য করে সেই চূড়ান্ত জয়লাভ করে। প্রকৃতিবিজ্ঞানী ডারউইনের 'Survival of the fittest' তত্ত্ব পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মানুষ তথা জীবজগৎকে নিরন্তর ঝড়-ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার পর নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হয়েছে। অনেক কষ্ট করে ক্ষুধার অন্ন জোগাড় করতে, হয়েছে, বন্য হিংস্র প্রাণীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে। দীর্ঘকালের জীবনসংগ্রামে মানবজাতির অনেক শাখা পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। যারা টিকে আছে, একমাত্র সহনশীলতার মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জনের জন্যই তারা পৃথিবীতে টিকে আছে। বিভিন্ন আঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষ কেবল অধ্যবসায় দ্বারাই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অনেক ত্যাগ, অনেক সংগ্রামের পরই মানুষের আজকের অবস্থান। অতীতে আজকের সভ্য মানুষ ছিল গুহাবাসী, পরিধান করত গাছের পাতা, বাকল, ঝলসে খেত কাঁচা মাংস। একে একে আবিষ্কার করেছে তারা আগুন, পরিধান করেছে বস্ত্র, আবিষ্কার করেছে আজকের সভ্য সমাজ। আজ যে সুসভ্য মানুষ টিকে আছে এটা একমাত্র সহনশীলতার ফলেই সম্ভবপর হয়েছে।
তাইতো এ জগৎসংসারে সুখের স্থান আছে, তবে তা দুঃখের পাশাপাশি। দুঃখকে জয় না করলে কেউ সুখের মুখ দেখতে পায় না। সুখের মুখ দেখতে হলে দুঃখকে সহ্য করতে হয়। দুঃখ-দারিদ্র্য ও অভাব-অভিযোগের কাছে যে ব্যক্তি মাথা নত করে তার জন্য এটা অভিশাপ। সহনশীল ব্যক্তি অনবরত সংগ্রাম করে ক্রমশ বন্ধুর পথ পেরিয়ে জয়ের পথে অগ্রসর হয়। সে কখনো কোনো বাধাবিপত্তির কাছে মাথা নত করে না।

৩২. ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

[রা. বো. ১১; য. বো. '১৫; কু. বো. '০৯; ব. বো. '১১] [ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, টাঙ্গাইল; ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম; পাবনা জিলা স্কুল; ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ]

ভাব-সম্প্রসারণ: ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কাছে পৃথিবীর সবকিছু তুচ্ছ। সৌন্দর্য, ভালোবাসা, অনুভূতি কোনো কিছুর মূল্য নেই তার কাছে। খাদ্য ছাড়া কোনো মানুষ বাঁচতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের জন্য খাদ্য মৌলিক প্রয়োজন। মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য দিনরাত কাজ করে। যদি কেউ তার ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে যেকোনো নিচু কাজ করতে বাধ্য হবে। যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত থাকে তার কাছে নৈতিক উপদেশ, দর্শনের কোনো মূল্য নেই। এটা স্বাভাবিক যে, ক্ষুধার্ত মানুষ সবসময়ই রাগী এবং সামান্য কারণেই বিদ্রোহ করতে পারে। ভালোবাসা, সহানুভূতি অথবা তোষামোদি কোনো কিছুই তাকে বশ করতে পারে না। কোনো উপদেশ অথবা যুক্তিবাক্য তাকে শান্ত করতে পারে না।

সে সব ধরনের প্রতিষ্ঠা খারাপ বা ভালো অথবা রাজনৈতিক বা সামাজিক যাই হোক না কেন তার বিরোধী। সে আমাদের সমাজব্যবস্থা ধ্বংস করতে পারে। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, "A hungry man is an angry man."

৩৩. বার্ধক্য তাহাই- যাহা পুরাতনকে
মৃত্যুকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে

[মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা; সরকারি পিএন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী; জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট; পুলিশ লাইনস স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর; আনজুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোনা]

ভাব-সম্প্রসারণ : বয়সের মাপকাঠিতে তারুণ্য বা বার্ধ্যক্যকে পরিমাপ করা যায় না। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ও কর্মস্পৃহার তারতম্য মানুষকে তরুণ বা বৃদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করে। মানুষ শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য ও যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়। বার্ধক্য ব্যক্তির নানা ধরনের শারীরিক সক্ষমতা হ্রাস করতে পারে ঠিকই, কিন্তু প্রত্যেকরে মানসিকভাবে জরাগ্রস্ত করতে পারে না। তাদের কর্মশক্তি ও মানসিক শক্তি অনেক তরুণকে হার মানায়। অপরদিকে এমন অনেক তরুণ রয়েছে, যারা নতুনকে গ্রহণ করতে পারে না, অন্ধবিশ্বাস ও গতানুগতিক চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে, সত্যকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়। তারা আসলে তারুণ্যের খোলসে বার্ধক্যকে লালন করে। আর যেসব বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়, ইতিবাচক ভাবনায় জীবনকে পরিচালিত করে, তারা প্রকৃতপক্ষে তারুণ্যের অমিতশক্তি ধারণ করে। তরুণরা সব সময়ে আলোর পথের যাত্রী। কঠিন সত্যকে মেনে নিয়ে তারা নতুন ইতিহাস রচনা করতে পারে। যুক্তির আলোয় কুসংস্কারকে বাতিল করে তারা প্রতিষ্ঠা করে নতুন সত্য। তারা ধ্বংস ও মৃত্যুকে পেছনে ফেলে সৃষ্টির আনন্দে এগিয়ে যায়। তারুণ্যের এই সংকল্প ও অনুভূতি যেকোনো বয়সের মানুষের মধ্যে থাকতে পারে। প্রকৃত বৃদ্ধ তারা, যারা তারুণ্যের দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নিতে চায় না, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনকে অস্বীকার করে, নতুন সূর্যের আলোয় দ্বিধাবোধ করে। তারা তারুণ্যের অগ্রযাত্রায় অংশ নেওয়ার পরিবর্তে বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

৩৪. ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে
ধ্বনির কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।

[দি. বো. '১০] [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ভাব-সম্প্রসারণ: প্রতিধ্বনির নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রতিধ্বনির উৎপত্তি ধ্বনি থেকেই। প্রতিধ্বনি সর্বদাই ধ্বনির কাছে ঋণী হয়েও এ ঋণ কখনো স্বীকার করে না। প্রথমে ধ্বনির সৃষ্টি হয়; পরক্ষণেই সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। ধ্বনির কাছে সে ঋণী। কিন্তু সে তা স্বীকার করতে চায় না। কম্পমান প্রতিধ্বনি তার ভৌতিক ধ্বনির দ্বারা জন্মদাতাকে ব্যঙ্গ করে। সে প্রাণপণে চেষ্টা করে ধ্বনির অস্তিত্ব মুছে ফেলতে। আমাদের এ মানবসমাজেও এমনি অনেক লোক আছে যারা উপকারীর উপকার স্বীকার করে না। কেবল তাই নয়, উপকারীর অস্তিত্ব মুছে ফেলতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না; সংসারে এ একটা কঠিন সত্য। মানুষ ভাবতেই চায় না যে, সে অন্যের কাছে ঋণী। সে নিজের ক্ষমতার বড়াই করে বেড়ায়।

এ মানব সংসারে প্রতিধ্বনির মতো অকৃতঘ্ন লোকের অভাব নেই। বিচিত্র মানব চরিত্রের কারণেই হয়তো যে উপকারীর দ্বারা বিপন্ন মানুষের বিপদমুক্তি ঘটে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারে কোথায় যেন বাধে।

কত মহাপ্রাণ পরহিতব্রতী অপরের উপকার করার বিনিময়ে লাভ করেছেন চরম অপমান, নিষ্ঠুর ব্যঙ্গবিদ্রূপ এবং সীমাহীন অবজ্ঞা তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এরপরেও তাঁরা তাঁদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। কারণ প্রতিধ্বনির মতো এসব অকৃতজ্ঞ অধমের আচরণ আদর্শ বলে গণ্য হতে পারে না।উত্তম আদর্শস্বরূপ, অধম সর্বদাই উপেক্ষণীয়।

হাদিসে বলা হয়েছে যে, "যারা মানুষের কাছ থেকে উপকার পেয়ে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, তারাই আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ।" মহাকবি শেখ সাদী বলেন, "কৃতজ্ঞ কুকুর অকৃতজ্ঞ মানুষের চেয়ে শ্রেয়।" জগতের প্রকৃত উপকারী ব্যক্তি তাঁর জীবন বিপন্ন করে হলেও মানুষের কল্যাণে কাজ করে যান।

প্রবন্ধ রচনা

১. স্বদেশপ্রেম

[ঢা. বো. '২০, '১৯, '১০, '০৫; রা, বো, '১৭, '১৫, '১১, '০৮, '০২; য. বো, '১৯, '১৫, '১৪, '১০, '৩৫; কু. বো. '১৯, '১৩, '১১, '০৭, '০২; চ. বো. '১৯, '১৭, '১৩, '০৭, '০৫; সি. বো. '১৫, '১৪, '১০; ব. বো. '১৭, '১৬, '১৪, '১০, '০৮, '০৪; দি, বো. '১৯, '১৭, '১৪, '১০] [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; ইসলামি এডুকেশনাল ট্রাস্ট (আইইটি) সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়; আল-আমিন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ, চাঁদপুর; বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বান্দরবান; নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; সিটি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল, দিনাজপুর; গাইবান্ধা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গাইবান্ধা]

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালবেসে।" -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা: যে দেশ আলো দিল, মুখে দিল অন্নজল, দিল পরনের বস্ত্র, তার প্রতি যদি সেই দেশের শ্যামলস্নেহে প্রতিপালিত সন্তানদের ভালোবাসা না থাকে, তবে তারা কেবল অকৃতজ্ঞই নয়- অধম। স্বদেশের মানুষ, স্বদেশের রূপ-প্রকৃতি, তার পশুপাখি, প্রতিটি ধূলিকণা তার সন্তানদের কাছে প্রিয়, পরম পবিত্র। দেশমাতৃকার মৃন্ময়ী মূর্তি কেবল কাদা-মাটি-জলে নির্মিত প্রতিমা মাত্রই নয়, হৃদয়ের নিবিড় ভালোবাসায় এবং গভীর মমত্ববোধে সে সন্তানের অন্তরের অন্তঃস্থলে পরিগ্রহ করে চির আরাধ্য চিন্ময়ী মূর্তি। স্বদেশের কাছে মানুষ সকল। দিক দিয়েই ঋণী। স্বদেশপ্রেম সেই ঋণ-স্বীকার ও ঋণ শোধের উপায়মাত্র।

স্বদেশপ্রেম কী: যে ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং বড় হয়ে ওঠে; তার প্রতি, সেখানকার মানুষের প্রতি তার একটা স্বাভাবিক আন্তর আকর্ষণ গড়ে ওঠে। স্বদেশের পশুপাখি, তরুলতা থেকে শুরু করে তার প্রতিটি ধূলিকণা পর্যন্ত তার পরম কামনার ধন। সে তখন আবেগবিহ্বল কণ্ঠে গেয়ে ওঠে- "আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি।" দেশের প্রতি এই আজন্ম আকর্ষণ থেকেই স্বদেশপ্রেমের উন্মেষ। তখন মানুষ উপলব্ধি করে, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস বলেছেন-

"জননী গো জন্মভূমি তোমারি পবন
দিতেছে জীবন মোরে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে।
ত্যাজিয়ে মায়ের কোল, তোমারি কোলেতে
শিখিয়াছি ধূলি-খেলা, তোমারি ধূলিতে।"

'স্বদেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ: স্বদেশপ্রেম মানুষের অন্তরে কখনো থাকে সুপ্ত, কখনো জাগ্রত। কিন্তু স্বদেশপ্রেমের মূল গ্রোথিত থাকে অন্তরের অন্তস্থলে। ঐক্যবদ্ধভাবে যখন দেশের সকল মানুষ একই জীবনধারায়, একই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারায় পুষ্ট হয়ে একই আদর্শের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে, তখনই মৃন্ময়ী দেশ হয়ে ওঠে চিন্ময়ী। 'ফুলে ও ফসলে, কাদা-মাটি-জলে' দেশ তখন যথার্থ মাতৃভূমি হয়ে ওঠে। মহাকবি কায়কোবাদ তাঁর 'বাংলা আমার' কবিতায় লিখেছেন-

"বাংলা আমার আমি বাংলার
বাংলা আমার জন্মভূমি

গঙ্গা ও যমুনা পদ্মা ও মেঘনা
বহিছে যাহার চরণ চুমি।"

স্বদেশপ্রেমের উন্মেষ: সুখের দিনে স্বদেশপ্রেম থাকে সুপ্তিময়। কিন্তু দুঃখের দিনে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে স্বদেশপ্রেমের হয় শুভ উদ্বোধন। পরাধীনতার দুঃখ-বেদনায়, পরদেশীয় অকথ্য নির্যাতনে অন্তরের সুপ্ত স্বদেশপ্রেমের ঘুম ভাঙে। কিংবা দেশ যখন বিদেশি শত্রুর আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়, তখন সমগ্র জাতি স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশের লাঞ্ছনা মোচন ও মর্যাদা রক্ষাকল্পে প্রাণ দেবার জন্য দলে দলে ছুটে যায়। তখন মনে হয়, "নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।" দেশ-দেশান্তরের ইতিহাসই তার সাক্ষী।

স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ: দেশপ্রেমের উদ্ভব আত্মসম্ভ্রমবোধ থেকে। যে জাতির আত্মসম্ভ্রমবোধ যত প্রখর, সে জাতির স্বদেশপ্রেম তত প্রবল। স্বদেশপ্রেম এক প্রকার পরিশুদ্ধ ভাবাবেগ। নিঃস্বার্থ, হিংসাবিহীন দেশপ্রেমই প্রকৃত স্বদেশপ্রেম। ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহত্তর স্বার্থের দিকে যখন মন পরিচালিত হয়, যখন আত্মকল্যাণের চেয়ে বৃহত্তর কল্যাণবোধ সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখনই জ্বলে ওঠে স্বদেশপ্রেমের নিষ্কলুষ প্রদীপশিখা। স্বদেশের মান-মর্যাদা এবং তার গৌরব রক্ষাকল্পে শহিদ হয়েছে কত অমর প্রাণ। দেশসেবার পথে বাধা বিস্তর, অত্যাচার সীমাহীন। কিন্তু পরদেশী শাসকের রক্তচক্ষু, উদ্যত অস্ত্র কিংবা পথের কোন বাধা তাঁদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে নিবৃত্ত করতে পারে না। তাঁরা মৃত্যু-ভয়কে তুচ্ছ করে এগিয়ে যায় দেশমাতৃকার ভালোবাসার টানে। তাই কবি রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন-

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?"

স্বদেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত: স্বদেশকে ভালোবাসতে গিয়ে যুগে যুগে বহু নেতা ও মনীষী নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। উপমহাদেশের তিতুমীর, রানা প্রতাপ, শিবাজী, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লচাকী, সূর্যসেন, প্রীতিলতা, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়ে দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। বাংলাদেশে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ মোঃ রুহুল আমিন, মতিউর রহমান, মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, মোস্তফা কামাল, মুন্সী আবদুর রব, নূর মোহাম্মদ শেখ, হামিদুর রহমান প্রমুখ অকাতরে জীবন দিয়ে দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত হিসেবে অমর হয়ে আছেন। এছাড়া শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হক, আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জওহরলাল নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধী, ভ.ই. লেনিন, মাও সেতুং, গ্যারিবল্ডি, জর্জ ওয়াশিংটন, কামাল পাশা, হো. চি. মিন, সাদ্দাম হোসেন, মাহাথির মোহাম্মদ প্রমুখ দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অন্ধ স্বদেশপ্রেম: স্বদেশপ্রেম দেশ ও জাতির গৌরবের বস্তু। কিন্তু অন্ধ স্বদেশপ্রেম ধারণ করে ভয়ঙ্কর রূপ, তা জাতিতে জাতিতে অনিবার্য করে তোলে সংঘাত ও সংঘর্ষ। অন্ধ স্বদেশপ্রেম কেবল স্বদেশের কথাই চিন্তা করে। আবার স্বদেশের জয়গান যদি অপরের স্বদেশপ্রেমকে আহত করে, তবে সেই অন্ধ স্বদেশপ্রেম বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে ডেকে আনে ভয়াবহ রক্তাক্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত। হিটলারের জার্মানি এবং মুসোলিনীর ইতালি উগ্র জাতীয়তার সেই নগ্ন বীভৎস প্রকাশের মধ্যদিয়ে সেদিন বিশ্বমানবতার বক্ষে পদস্থাপনে উদ্যত হয়েছিল।

স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম: স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের কোন অমিল নেই, কোনো সংঘাত নেই। স্বদেশপ্রেম তো বিশ্বপ্রেমেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। বলাবাহুল্য, স্বদেশ বিশ্বেরই অন্তর্ভুক্ত। স্বদেশের মধ্যস্থতায় বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। স্বদেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে আমরা বিশ্বপ্রেমের জগতে উপনীত হতে পারি। স্বদেশবাসীকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসতে পারলে আমরা বিশ্ববাসীকেও মনে প্রাণে ভালোবাসতে পারি। আবার যে স্বদেশবাসী, সে বিশ্ববাসীও বটে। স্বদেশের নদী নির্ঝর, বন-উপবন, গিরি-পর্বত, তার মানুষ এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশ্বেরও মহা সম্পদ। কাজেই, স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের উৎস এক ও অভিন্ন। তাদের মধ্যে কোনো সংঘাত নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা,
তোমাতে বিশ্বময়ীর- তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

দেশজননী ও বিশ্বজননী এক ও অভিন্ন। কারণ, দেশজননীর বুকের ওপর বিশ্বজননীরও আঁচল পাতা। স্বদেশ এবং বিশ্ব আমাদের ঐক্য চেতনার এপিঠ আর ওপিঠ।

স্বদেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য: স্বদেশপ্রেম মানবচরিত্রের এক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ যেমন দেশপ্রেমের পরিচয় বহন করে, তেমনি সাহিত্য, শিল্পকলা বা অন্যান্য জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে কাজ করাও দেশপ্রেমের লক্ষণ। তাই প্রত্যেকের কাজ হবে যার যার ক্ষেত্রে দেশের কল্যাণের কথা চিন্তা করে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করা-যাতে স্বদেশের সবরকম উন্নতি সাধিত হয়। দেশপ্রেম নিজের দেশকে জানতে শেখায়, ভালোবাসতে শেখায়। স্বদেশপ্রেমের মাধ্যমেই বিশ্বপ্রেমে এগিয়ে যাওয়া যায়। ফলে মানবতার মহান আদর্শের সম্প্রসারণ ঘটে।

উপসংহার: স্বদেশপ্রেম মানুষের সহজাত মহৎ প্রবৃত্তি। যথার্থ দেশপ্রেমিক দেশের স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থাপন করেন না নিজের স্বার্থকে। দেশের স্বার্থে সহাস্যে আত্মবলিদান করতে পারেন তিনি। গ্যারিবল্ডী, লেনিন, সুভাষ বসু, রানা প্রতাপ, চাঁদ সুলতানা, ওয়াশিংটন, জোয়ান অব আর্ক, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বাংলাদেশের বীরশ্রেষ্ঠগণ সেরকম দেশপ্রেমিক। আমাদের সকলকে স্বার্থহীন দেশপ্রেমিক হতে হবে। ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে স্বদেশপ্রেমকে। তবেই স্বাধীন জাতির মর্যাদা নিয়ে আনন্দের সাথে বেঁচে থাকা যাবে।

২. সময়ানুবর্তিতা **[ব. বো. '০২]**

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, উত্তরা, ঢাকা; ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা; সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, টঙ্গী, গাজীপুর; মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, মিরপুর, ঢাকা; নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ; রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল, রাজশাহী; রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী; হরিমোহন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর; কুমিল্লা জিলা স্কুল, কুমিল্লা; সেন্ট প্লাসিডস্ হাই স্কুল; ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম; বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল; উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশাল, পিরোজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পিরোজপুর; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী; গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ময়মনসিংহ; আনজুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোনা]

ভূমিকা: মর্ত্যের মানুষের চিরন্তন বাণীহারা কান্না- 'নাই নাই, নাই যে সময়।' অনন্ত প্রসারিত সময়ের যাত্রা পথ। পৃথিবীর 'পথিক' মানুষ সময়ের সেই পথরেখা ধরে অগ্রসর হয়। সময়ের মতো মানবজীবন যদি অন্তহীন হতো, তাহলে দুঃখ থাকত না মানুষের। সময় নিরবধি, কিন্তু মানবজীবন সংক্ষিপ্ত। এখানেই গরমিল। মানুষ চায় তার সংক্ষিপ্ত জীবনায়তনের মধ্যে বহুতর কর্মের উদযাপন। কিন্তু সময় তা মঞ্জুর করে না। কর্ম উদযাপনের আগেই তার বিদায়ের ডাক এসে পড়ে। মানুষের কাছে সময় তাই অমূল্য ধন। সময় চলে যায় নদীর স্রোতের মতো। চিরন্তন প্রবহমানতাই তার মৌল বৈশিষ্ট্য। মুহূর্তের জন্যও কোথাও সে স্থির থাকে না, কারো জন্য অপেক্ষা করে না। মানুষের জীবনও সময়ের সেই অনন্ত ছন্দে সুর বেধেছে। সময়ের অন্তহীন, প্রবাহে সে ছুটে চলেছে জন্ম থেকে মৃত্যুর অভিমুখে।

সময়ের গুরুত্ব: সময়ের এই অস্থির ধাবমানতার জন্যই জীবন মানুষের কাছে পরম মূল্যবান। সময় অনন্ত, কিন্তু জীবন সীমাবদ্ধ। তার এক প্রান্তে জন্ম, অন্য প্রান্তে মৃত্যু। এই জন্ম ও মৃত্যুর শাসনে জীবন সদা সঙ্কুচিত। মানুষ চায় সময়ের অন্তহীনতার মতো অন্তহীন জীবন; কিন্তু পায় না। মানবজীবনের চরম ট্র্যাজেডি এখানেই। জীবন যা শুধু ঘন্টা আর মিনিটের সমাহার মাত্র। জীবনের এই সীমাবদ্ধতার জন্যই সময় এত আদরের, এত মূল্যবান। সময় অনন্ত, কিন্তু জীবন তার অতি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। জীবন থেকে যে সময় একবার চলে যায় তা আর ফিরে পাওয়া যায় না। সময়ের গুরুত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে রবার্ট ব্রাউনিং বলেছেন, "একটা দিন চলে যাওয়া মানে জীবন থেকে একটা দিন ঝরে যাওয়া।" তাই সময়ানুবর্তিতার গুরুত্ব সম্পর্কে যথার্থ সচেতন থাকা প্রয়োজন। সময় জীবনকে গঠনের যে সুযোগ দেয়, তাকে কাজে লাগালেই সাফল্য অনিবার্য হয়ে ওঠে। সময়কে যারা অবহেলা করে, সময়ের মূল্যবোধ সম্পর্কে যারা সচেতন নয়, তারা কখনোই সুখের সন্ধান পায় না। সুতরাং মানবজীবনে সময়ানুবর্তিতার গুরুত্ব অপরিসীম।

সময়ের অবহেলার পরিণাম: জীবনের এই সীমাবদ্ধ অবসরে দুর্লভ সময়ের যে ভগ্নাংশটুকু পাওয়া যায়, তার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই জীবন সার্থক এবং সুখময় হয়ে ওঠে। কাজেই জীবনের সংক্ষিপ্ত সীমায়তনের মধ্যে যে পরম মূল্যবান সময় আমরা হাতে পাই, সেই দুর্লভ সময় যদি অবহেলা করে, আলস্যভরে কাটিয়ে দেই, তাহলে তা হবে সময়ের নির্বোধ অপচয় মাত্র। সেই অপচয়ের পরিণাম আমাদের জীবনে একদিন মর্মান্তিক দুঃখ আর অনুশোচনা নিয়ে আসবে। তখন বুকফাটা আর্তনাদ কিংবা এক সমুদ্র অশ্রুবর্ষণে কিংবা অনুতাপে দগ্ধ হলেও সেই আলস্যে অতিবাহিত সময় আর ফিরে পাওয়া যাবে না। প্রবাদে আছে-

"সময় কারো হাতধরা নয় সময় হয় জলের মতন।"

সময়ের মূল্যবোধের অর্থ: প্রকৃতপক্ষে, সময়ের যথার্থ মূল্যবোধই জীবনের সাফল্য অর্জনের সোপান। সময়ের মূল্যবোধ হলো, যে সময়ের যে কাজ, তা সেই সময়ে সম্পাদন করা। যে তা করে না, সে করে সময়ের অমর্যাদা এবং পরাজয়ই হয় তার জীবনের চরম পরিণতি। সময়ের এই অবহেলার জন্য ভবিষ্যতে তাকে অনুশোচনা করতে হবে। যে কৃষক ফসলের ঋতুতে ফসলের বীজ বপন না করে আলস্যে সময় অতিবাহিত করে, সে কীভাবে ফসল ওঠার সময় খামার পূর্ণ ফসল আশা করতে পারে? সময় চলে গেলে তখন আর কান্নাকাটি করেও লাভ হয় না। প্রবাদে আছে-

"সময়ে না দেয় চাষ
তার দুঃখ বার মাস।"

মানবজীবনেও সেই একই কথা। জীবনে যখন শক্তি থাকে, সামর্থ্য থাকে, তখন আলস্যে অযথা কালহরণ করে জীবন কাটালে শেষ বয়সে অবশ্যই দুঃখ ভোগ করতে হয়। তাই সময়ের মূল্যবোধের গুরুত্ব অনেক।

সময়ের অপচয়ের অর্থ: সময়ের মূল্যবোধের অভাবের পিছনে আছে মানুষের নিরাসক্ত জীবনবোধ, আলস্য, উদাসীনতা এবং অদৃশ্য সময়ের নিঃশব্দ অনন্ত যাত্রা। সময়কে চোখে দেখা যায় না, তার অনন্ত যাত্রার ঘন্টাধ্বনিও শোনা যায় না। মানুষ তাই মনে করে, সময়ও বুঝি তার আলস্যের অনড় পাথরের মতো স্থির হয়ে আছে। তাই সময় পৃথিবীর অলস, কর্মবিমুখ মানুষদের ফাঁকি দিয়ে তার অনাদি যাত্রাপথে প্রস্থান করে। কিন্তু সময় পৃথিবীর সেই অলস, কর্মবিমুখদের আলস্য এবং কর্মবিমুখতাকে ক্ষমা করে না। সে তাদের কপালে দুঃখময় ভবিষ্যতের অভিশাপ এঁকে দিয়ে প্রস্থান করে। কিন্তু জীবনের সঙ্গে বা সময়ের সঙ্গে যারা প্রবঞ্চনা করে না, সময়ও তাদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা না করে তাদের জন্য আশীর্বাদ বর্ষণ করে যায়। প্রকৃত অর্থে বাঁচতে জানে তারাই। জীবন এবং সময় অমূল্য। সময়ের অপব্যবহারের অর্থ যেমন অপচয়, দুর্লভ মানবজন্মও তেমনি অপচয়ের জন্য নয়।

সময়ের সদ্ব্যবহার: শৈশবই কর্মজীবনে প্রবেশের তোরণ দ্বার। এই সময়ই জীবনের প্রস্তুতির কাল। ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সকল দায়িত্বভার বহনের যোগ্যতা এই সময়েই অর্জন করতে হয়। শৈশব কালের প্রতিটি মুহূর্তকে যথাযথভাবে ব্যবহার করলে এবং অমূল্য সময়ের অপচয় না করে তার প্রতিটি দুর্লভ মুহূর্তকে জীবনক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে পরবর্তীকালে সুখ ও শান্তি দুই-ই পাওয়া যাবে। শৈশবেই আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, জীবন মূল্যবান এবং তার অন্তর্ভুক্ত সময় অত্যন্ত সীমিত ও অমূল্য। সেই অমূল্য সম্পদ আছে আমাদের সকলের অধিকারে, সকলের হাতের মুঠোয়। সৎ এবং মহৎ কাজে লাগাতে পারলেই হবে তার পরম সদ্ব্যবহার। কর্মই সময়ের পরিমাপের একমাত্র মাপকাঠি। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কে কত মহৎ এবং মূল্যবান কাজ সম্পন্ন করতে পারে, তা দিয়েই তার সাফল্য বিবেচিত হয়। তাই জীবনে মানুষ কতদিন বেঁচেছে, তা বড় কথা নয়- সে জীবনে কত মহৎ কর্ম সম্পন্ন করেছে এবং সেসব কর্মানুষ্ঠানের ফলে মানবসমাজ কতখানি উপকৃত হয়েছে, তা-ই তার সাফল্যের পরিচায়ক। তাই আবাল্য অভ্যাসের দ্বারাই শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন এবং তার দ্বারাই দুর্লভ সময়ের সদ্ব্যবহার 'আয়ত্ত করা সম্ভব। সেই অভ্যাসের দ্বারা, সেই প্রস্তুতির ফলে জীবনে আসে সময়ানুবর্তিতা। সময়ানুবর্তিতা জীবনে সাফল্য লাভের চাবিকাঠি এবং সময়ানুবর্তিতার মাধ্যমে কল্যাণপূত কর্মেই জীবনের চরম সার্থকতা। কবি বলেন,

"পরিশ্রম ধন আনে, কর্মে আনে সুখ,
আলস্যে দারিদ্র্য আনে, পাপে আনে দুঃখ।"

উপসংহার: সময়ের অপচয় একটা বড় অপরাধ। যারা সময় নষ্ট করে তারা জীবনে উন্নতি করতে পারে না। সময়ের যথার্থ মূল্যবোধই ব্যক্তি এবং জাতীয় জীবনের সাফল্যের সোপান। যেহেতু সময় জীবনের সমস্ত সাফল্য ও সুখের উৎস, তাই প্রত্যেককে সময়ের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং তার সদ্ব্যবহার করা উচিত। তবেই জাতি পাবে গতি, দেশ হবে সমৃদ্ধ, জীবন হবে আনন্দময়।

৩. অধ্যবসায়

[সকল বোর্ড ২০১৮; স. বো. '৯৮; ঢা. বো. '১৭, '১৩, '০৮, '০৬, '০৪; রা, বো, '১৪, '১১, '০৯, '০৭; য. বো. '১২, '০৯; কু. বো. '১৭, '১৫, '০৮, '০৬, '০৪; চ. বো, '১৬, '১৫, '১২, '০৯, '০৬; সি. বো, '২০, '১৬, '১২, '০৮; ব. বো. '১৫, '১৩, '১১; দি. বো, '২০, '১৬, '১৫, '১৩, '১১, '০৯] [ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম; বগুড়া জিলা স্কুল, বগুড়া]

"পারিব না এ কথাটি বলিও না আর কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার,
পাঁচ জনে পারে যাহা,

তুমিও পারিবে তাহা
পার কি না পার কর যতন আবার
একবারে না। পারিলে দেখ শতবার।" - কালিপ্রসন্ন ঘোষ

ভূমিকা: মানুষ আজ পর্যন্ত যতগুলো অভ্যাস আয়ত্ত করেছে তার মধ্যে অধ্যবসায়ই শ্রেষ্ঠ। এর বলে মানুষ অসাধ্যকে সাধন করতে পারে, অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। অধ্যবসায় ছাড়া কঠিন কাজে সফলতা লাভ করা যায় না। শত বাধাবিঘ্নের সাথে লড়াই করে যে জয়ী হতে পারে, সে-ই জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে। সুতরাং মানুষের উন্নতির জন্য সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য সোপান হচ্ছে অধ্যবসায়।

অধ্যবসায় কী: কোনো কাজে সফলতা লাভের জন্য বারবার চেষ্টা করার নাম অধ্যবসায়। অধ্যবসায় একটি শ্রেষ্ঠ গুণ। প্রকৃতপক্ষে অধ্যবসায় বলতে মানব চরিত্রের কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ বোঝায়। উদ্যোগ, পরিশ্রম, আন্তরিকতা, মনোবল প্রভৃতি গুণ একত্রিত হয়েই অধ্যবসায়ের পরিপূর্ণ রূপ সৃষ্টি করে। মনের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজে আত্মনিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের অন্যান্য গুণ যখন কাজে লাগানো হয় তখনই অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। অধ্যবসায়ের বলেই মানুষ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। জগতের সর্বত্রই অধ্যবসায়ের জয় ঘোষিত হচ্ছে। সকল প্রাণীই তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বারবার প্রচেষ্টা চালায়। জীবনের সফলতার জন্য অধ্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য কর্মপ্রবাহে ফুটিয়ে তুলতে হয় এবং তাতে জীবনের পরিপূর্ণতা লাভের পথ সহজ হয়। মানুষের আজকের এ প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছে অধ্যবসায়।

অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা: অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুভব করা যায়। মানবজীবনে প্রত্যেক কাজেই বাধাবিপত্তি দেখা দিতে পারে। কিন্তু সে বাধাকে ভয় করলে চলবে না। সেসব বাধা অতিক্রম করে যথার্থ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য। জীবনের এই চলার পথ সহজ করার জন্য প্রয়োজন অধ্যবসায়ের। জীবনের পথে যেসব বাধা থাকে সেসব জয় করতে না পারলে মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব নয়। হৃদয়ের প্রবল শক্তি এবং সাহস দিয়ে সকল বাধা জয় করতে হয়। অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সেই জয় এবং সফলতা আসে।

মানবসন্তান হিসেবে ভূমিষ্ঠ হলেই তাকে প্রকৃত মানুষ বলা যায় না। তাকে মনুষ্যত্ব অর্থাৎ, মানবিক গুণাবলি অর্জনের ভেতর দিয়ে মানুষ হতে হয়। জীবনের পরিবেশের প্রবল প্রতিকুলতার মধ্যে কেবল অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সাফল্যের সোনালি শিখরে পৌছানো যায়। মনীষীরা সাধনা করে জীবনে সফলকাম হয়েছেন। তাঁদের অধ্যবসায়ের গুণেই আজ মানুষ উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করেছে। বর্তমান বিশ্বে মানবজীবন সুখকর করার আয়োজনের পিছনে আছে অনন্ত অধ্যবসায়। জীবনের সামনের বাধা অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে একদিনে সম্ভব হয় নি। এর জন্য বহু মানুষকে বহুদিন ধরে অধ্যবসায়ী হতে হয়েছে। পূর্বপুরুষের অধ্যবসায় বিশ্বের মানুষের সভ্যতার পথ সহজ করেছে, জীবনে এনেছে সুখের সমারোহ। মনে রাখতে হবে, রাতের আঁধার কেটে যেমন দেখা দেয় দিনের আলোক রেখা, তেমনি বার বার চেষ্টার পর মানুষের ভাগ্যাকাশে উদিত হয় সাফল্যের শুকতারা। জীবনের প্রথম ব্যর্থতাকে মনে করতে হবে সাফল্যের প্রথম সোপান। তাই ইংরেজিতে বলা হয়েছে, "Failure is the pillar of success." জগতে যাঁরা বড় হয়েছেন, অমর হয়েছেন, তাঁরা সবাই অধ্যবসায়ী ছিলেন। চিরায়ত শিল্প, সাহিত্য, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার- সবই মানুষের অধ্যবসায়ের ফল। কাজেই অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

অধ্যবসায় ও প্রতিভা: কেউ কেউ মনে করেন, অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী না হলে বড় কাজ সাধন করা যায় না। কিন্তু অধ্যবসায় ও পরিশ্রম ছাড়া শুধু প্রতিভায় কাজ হয় না। মহাবিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন বলেছেন, "আমার আবিষ্কারের কারণ প্রতিভা নয়, বহু, বছরের চিন্তাশীলতা ও পরিশ্রমের ফলে দুরূহ তত্ত্বগুলোর রহস্য আমি ধরতে পেরেছি। অস্পষ্টতা হতে ধীরে ধীরে আমি স্পষ্টতার দিকে উপস্থিত হয়েছি।" দার্শনিক ভলতেয়ার বলেছেন, "প্রতিভা বলে কিছুই নেই। পরিশ্রম ও সাধনা করে যাও, তাহলে প্রতিভাকে অগ্রাহ্য করতে পারবে।" ডালটন বলেছেন, "লোকে আমাকে প্রতিভাবান বলে, কিন্তু আমি পরিশ্রম ছাড়া আর কিছুই জানি না।" অর্থাৎ প্রতিভাকে সফল করতে হলে অধ্যবসায় প্রয়োজন।

ছাত্রজীবনে অধ্যবসায়: ছাত্রজীবনে অধ্যবসায়ের একান্ত প্রয়োজন। আলস্যপরায়ণ ও শ্রমবিমুখ ব্যক্তি কখনো বিদ্যালাভ করতে পারে না। অল্প মেধাশক্তিসম্পন্ন ছাত্রও অধ্যবসায়ী হলে সফলতা লাভ করতে পারে। কোনো ছাত্র একবার অকৃতকার্য হলে হয়ত পরিবার থেকে তাকে নানা ভর্ৎসনা শুনতে হয়, তাই বলে তাকে উদ্যম বা ধৈর্যহারা হলে চলবে না। আগের চেয়ে অধিক মনোবল নিয়ে তাকে চেষ্টা করতে হবে। তবে সাফল্য আসবেই। এ সত্য উপলব্ধি করেই কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন-

"কেন পার্শ্ব ক্ষান্ত হও, হেরি দীর্ঘ পথ
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?"

ব্যক্তিজীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব: যেকোনো ব্যক্তির জীবনে অধ্যবসায় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সকল মানুষের শক্তি বা ক্ষমতা এক রকম নয়, কিন্তু প্রত্যেককে উন্নত জীবনের সন্ধান পেতে হয়। সেখানে যদি অধ্যবসায়ের যথার্থ প্রয়োগ করা যায় তবে শক্তির স্বল্পতা সাফল্যের পথে কোনো বাধা হয়ে থাকতে পারে না। কাজের আগ্রহ, বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ, সুদৃঢ় সংকল্প এসব যদি ঠিক থাকে তবে কোনো ব্যক্তিই কোনো কাজে ব্যর্থ হয় না। মানুষকে তার প্রয়োজনীয় উপকরণ নিজের যোগ্যতা দিয়ে সংগ্রহ করে নিতে হয়। আর তাই ব্যক্তিজীবনে নিরলস অধ্যবসায় প্রয়োজন।

জাতীয় জীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব: জাতীয় জীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব জাতীয় জীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব কম নয়। কোনো জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য সে জাতির সকল নাগরিককে অধ্যবসায়ী হতে হবে। সবাই একনিষ্ঠভাবে জাতীয় স্বার্থ সাধনের জন্য সর্বশক্তি নিয়ে আত্মনিয়োগ করলেই মর্যাদাপূর্ণ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা সম্ভব। অবশ্য ব্যক্তিজীবনে অধ্যবসায়ের ফল জাতীয় জীবনের বৃহত্তম কল্যাণে আসে। বিশ্বের জ্ঞানী, মনীষী, আবিষ্কারক, ধর্মপ্রবর্তক, রাষ্ট্রনায়ক, কবি, সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক সকলেই অধ্যবসায়ের মাধ্যমে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। একেবারেই ক্ষুদ্র অবস্থা থেকে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জনের পেছনে অধ্যবসায় কেমন কাজ করেছে তার নিদর্শন বিশ্বের বহু মনীষীর জীবনে বিদ্যমান। ব্যক্তি, জাতি এবং বিশ্বের কল্যাণ সাধনের জন্য অধ্যবসায় খুবই প্রয়োজন।

অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত: জীবন সংগ্রামে সাফল্যের মূলমন্ত্র অধ্যবসায়। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস অধ্যবসায়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ডের সঙ্গে ছয়বার যুদ্ধে পরাজিত হয়েও অধ্যবসায় ত্যাগ করেন নি। পরপর ছয়বার পরাজয়ের পর তিনি যখন একটা নির্জন দুর্গে চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তখন একদিন দেখলেন একটা মাকড়সা সাতবার চেষ্টার পর দুটি কড়িকাঠে সূতা জড়িয়ে জাল তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে।

এই দৃশ্য দেখে তাঁর অন্তর অদম্য উৎসাহে ভরে গেল। তিনি পুনরায় সপ্তমবারের মতো যুদ্ধ করে শত্রু সৈন্যদের পরাজিত করে নিজের দেশ উদ্ধার করলেন। ইতিহাসে চিরস্মরণীয় অর্ধপৃথিবীর অধীশ্বর নেপোলিয়ন তাঁর কর্মের ভেতর দিয়ে রেখে গেছেন অধ্যবসায়ের অপূর্ব নিদর্শন। কোনো কাজকেই তিনি অসম্ভব বলে মনে করতেন না। তাই তিনি এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও একমাত্র অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ফরাসি জাতির ভাগ্যবিধাতার পদে অধিষ্ঠিত হতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু বহুকাল অধ্যবসায় চালিয়ে উদ্ভিদের চেতনাশক্তি ও স্পন্দন সম্পর্কে তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। এমনিভাবে বহু মনীষী তাঁদের অধ্যবসায় দ্বারা অবদান রেখে পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন।

উপসংহার: মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অধ্যবসায় একান্ত প্রয়োজন। যে অধ্যবসায়ী নয়, সে কখনো কোনো কাজে সফল হতে পারে না। বন্যপ্রাণীর মতো খেয়ে পরে সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় এবং মৃত্যুর সাথে সাথে তার নাম আর কেউ স্মরণ করে না। একমাত্র অধ্যবসায়ী লোকই তাঁর কর্মের মধ্যদিয়ে পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকেন।

৪. মানবকল্যাণে বিজ্ঞান

[ঢা. বো. '১৯, '১৭, ০৫; রা. বো. '১৭, '১৫; য. বো. '১৯, '১৩; কু. বো, '১৬, '০৬; চ. বো, '১৩, '১' ০৪; সি. বো. '১৬, '১৪, '১২, ০৬; ব. বো, '১৯, '১৬, '১৫, '১১, '০৭; দি. বো. ১৯, '১৫, '১৩, '১০] [হলি ক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা: ইবনে তাইমিয়া স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা; কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কক্সবাজার; আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল, দিনাজপুর; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী]

"যন্ত্রযোগে যে শক্তি প্রবল হয়ে ওঠে, তার দ্বারা এমনি
করে সমস্ত পৃথিবীকে সে অভিভূত করেছে,
এত লোককে তার নিজের দাসত্বে ব্রতী করতে পেরেছে-
তার এত অহংকার। আর সেই সঙ্গে এমন অনেক
সুযোগ সুবিধা আছে যা বস্তুত মানুষের জীবনযাত্রার
পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল।" - রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা: ইংরেজি ভাষায় একটা প্রবাদ আছে- 'Necessity is the mother of invention'- প্রয়োজনের তাগিদেই আবিষ্কারের জন্ম। জীবনসংগ্রামের তাগিদেই মানুষ অজানাকে জানতে চেয়েছে। অজানাকে জানার ইচ্ছা জন্ম দিয়েছে বিজ্ঞানের, আর বিজ্ঞান দিয়েছে মানুষকে গতি, সেই সঙ্গে স্বনির্ভরতার আশ্বাস। শুরু হলো বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। ক্রমে অজ্ঞানতার অন্ধকার বিদূরিত হলো বিজ্ঞানের সাধনায়। মানুষ করায়ত্ত করতে শিখল প্রকৃতির দুর্জয় শক্তিকে। বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়ে, আর প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে মানুষ অনিয়ন্ত্রিত প্রকৃতিকে আনল নিজের নিয়ন্ত্রণে, মানবকল্যাণে কাজে লাগালো বিজ্ঞানকে।

বিজ্ঞানচেতনার প্রসার: সেই আদিম যুগে গোষ্ঠীবদ্ধ যাযাবর মানুষের জীবনে যুগান্তর আনলো আগুনের আবিষ্কার আর কৃষিকার্য প্রচলন। সেই সময় গড়ে ওঠল ছোট ছোট গ্রাম। উদ্ভাবিত হলো.আদি কৃষিযন্ত্র 'লাঙল'। মানুষ ক্ষেতে জলসেচের জন্য তার বৈজ্ঞানিক বুত্তিকেও কাজে লাগাতে শিখল। শস্য সংরক্ষণ, ফসল থেকে আরও নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী (যেমন; কার্পাস থেকে সূতা) বানাতে শিখল, কুমোরের চাকা ঘুরিয়ে মানুষ বানাতে শুরু করল নানা ধরনের মাটির পাত্র। ঐ সময় বয়ন শিল্পেরও উদ্ভব ঘটে।

ভারি জিনিস সহজে তোলার জন্য ঐ সময় মানুষ কপিকল, আলম্ব প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্য নিতে শিখেছিল। 'প্যাপিরাস' জাতীয় নলখাগড়া থেকে মিসরের মানুষ প্রথম লেখার উপযোগী কাগজ তৈরি করল। ইরাক অঞ্চলের লোকেরা প্রথম চাকাযুক্ত গাড়ি বানিয়ে পরিবহন ব্যবস্থায় যুগান্তর আনলো। পানি তোলার উপযোগী বিশেষ ধরনের পাম্প এবং যন্ত্রচালিত ঘড়ি প্রথম আবিষ্কৃত হয় চীনদেশে। গ্রিসের মানুষেরা প্রথম পৃথিবী ও মহাকাশের মানচিত্র বানায়। প্রাণিবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, স্থাপত্যবিদ্যা এবং জ্যামিতির ক্ষেত্রে গ্রিকবিজ্ঞানীদের দান কম ছিল না। অন্যদিকে বীজগণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, শল্যচিকিৎসা, রসায়নশাস্ত্র, জীববিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের ও আরব দেশের বিজ্ঞানীরা যেসব তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন, তা মানুষের জীবনযাত্রাকে যথেষ্ট সহজ করে দেয়।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা: আজ বিজ্ঞানের জয়ধ্বনি ঘোষিত হলেও পৃথিবীতে তার সূচনা হয়েছিল অত্যন্ত দীনভাবে। বিজ্ঞানের বলে মানুষ আজ খনির অন্ধকারে আলো জ্বালাতে সক্ষম হয়েছে। বিজ্ঞানের শক্তিবলে মানুষ দানবীয় নদীস্রোতকে বশীভূত করে ঊষর মরুপ্রান্তরকে করেছে জলসিন্ত, ভূগর্ভের সঞ্চিত শস্য-সম্ভাবনাকে করে তুলেছে। সফল, দূর করে দিয়েছে পৃথিবীর অনুর্বরতার অভিশাপ। বিজ্ঞান আজ উর্বরতা দিয়ে ক্ষয়িষ্ণু বসুধাকে শস্যবতী করে তুলেছে। নব নব শিল্প প্রকরণে সে উৎপাদন জগতে এনেছে যুগান্তর এবং সুদূরকে করেছে নিকটতম। বিজ্ঞানের সাফল্যে জীবধাত্রী বসুধা আজ কলহাস্যমুখরা।

মানবকল্যাণে বিজ্ঞানের অবদান: প্রাগৈতিহাসিক মানবের আগুন আবিষ্কারের দিন থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত মানুষের অতন্দ্র সাধনা বিজ্ঞানকে করেছে সমৃদ্ধ, সভ্যতাকে করেছে গতিশীল। বাষ্পীয় শক্তিকে সে করেছে বশীভূত, বিদ্যুৎকে করেছে করায়ত্ত, মুঠোয় পুরে নিয়েছে পারমাণবিক শক্তিকে। ডাঙায় ছুটছে বাস, ট্রেন, ট্যাক্সি, জলে ঢেউ-এর ঝুঁটি জাপটে ধরে জাহাজ ছুটে চলেছে, আকাশ তোলপাড় করে উড়ে চলেছে দ্রুতগামী উড়োজাহাজ, মহাশূন্যে পাড়ি দিচ্ছে রকেট, স্পুটনিক, মহাকাশযান। অন্যদিকে বিজ্ঞান মৃত্যুর গ্রাস থেকে জীবনকে বাঁচিয়ে তুলতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

দৈনন্দিন জীবনে মানুষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে পূর্ণাঙ্গরূপে কাজে লাগিয়েছে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব ঘটে যাবার পর থেকে, উনিশ শতকে। ঐ সময়ই মানুষ বাষ্পের শক্তিকে নানা কাজে ব্যবহার করতে শিখে। তারপর আমরা ক্রমে ক্রমে বিদ্যুৎশক্তিকে কাজে লাগাতে শিখলাম। বিশ শতকে আমরা জ্বালানি কয়লা ছাড়াও পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস এমনকি পারমাণবিক শক্তিকে মানুষের কল্যাণের কাজে লাগাতে পেরেছি। বাষ্পশক্তি, প্রাকৃতিক গ্যাসের শক্তি, সর্বোপরি বিদ্যুৎশক্তির ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে নাগরিক জীবন থেকে গৃহস্থের ঘরে ঘরে। তাই আধুনিক কালে তার সাহায্য ছাড়া আমাদের এক মিনিটও চলে না। আর ঐ মিনিটের হিসেব করার জন্য প্রয়োজন হয় ছোট বড় ঘড়ির। তার কোনটা আবার ইলেকট্রনিক।

বাষ্পশক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমাদের রান্নাঘরে প্রেসার কুকার গৃহিণীর কাজকে সহজ করে দেয়। তার সঙ্গে থাকে বৈদ্যুতিক বা গ্যাসের চুলা, এমনকি সৌরচুল্লী। বায়োগ্যাসে কোনো অঞ্চলে গ্রামের ঘরে ঘরে আলো জ্বলে, তাতে রান্নার কাজ সহজ হয়। পরিবহন ব্যবস্থায় বিজ্ঞান তো রীতিমত যুগান্তর এনেছে। রোগনির্ণয়েও তার ভূমিকা কম নয়। আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে টেলিভিশন ও ভিডিও বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলেও পৌছে গেছে। ঘরে বসে আমরা এখন দেখছি এশিয়াড, বিশ্বকাপ ফুটবল, বিশ্বকাপ ক্রিকেট, অলিম্পিক গেমস ইত্যাদি খেলা। সৌরশক্তি চালিত পকেট ক্যালকুলেটর করে দিচ্ছে দুরূহ হিসাবনিকাশ। গৃহস্থালির কাজে কত রকম বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম যে আমরা ব্যবহার করছি, তার হিসেব দেওয়া কঠিন।

যেমন: রান্নার জন্য রয়েছে কুকিং রেঞ্জ, মশলাবাটা ও নানান খাদ্য গুঁড়া করার মেশিন, রয়েছে বাসন ও কাপড় ধোয়ার যন্ত্র। এছাড়া ঘর সাফাই মেশিন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, টাইপ থেকে শুরু করে ছোটদের জন্য রয়েছে ইলেকট্রনিক খেলনা।

বর্তমানে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবিসংবাদিত প্রভুত্ব। প্রভাতের শয্যাত্যাগ থেকে রাতের শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত বিজ্ঞান মানুষের খুবই অনুগত সহচর। রেডিও বা টেলিভিশনের প্রভাতি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙে আমাদের। বিজ্ঞানের কৌশলে ততক্ষণে কলে পানি এসে যায়। প্রয়োজন মতো কখনো সে পানি উষ্ণ, কখনো বা শীতল। গরমের সময় বৈদ্যুতিক পাখা না হলে আমাদের চলে না। ধনী লোকেরা এয়ারকুলার ব্যবহার করতে পারে। টেলিফোনের সাহায্যে হাজার হাজার মাইল দূরের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের খোঁজ- খবর নেওয়া যায়। প্রতিদিন বাজারে যাওয়ারও প্রয়োজন হয় না। বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত ফ্রিজের মধ্যে কয়েকদিনের বাজার এনে রেখে দেওয়া যায়। বাস, ট্রেন ও ট্যাক্সির সাহায্যে দ্রুতগতিতে স্থানান্তরিত হওয়া যায়। এসবই হচ্ছে বিজ্ঞানের কল্যাণে। এক কথায়, যন্ত্রবর্জিত জীবনযাত্রা বর্তমানে আর কল্পনা করা যায় না।

মানবকল্যাণে চিকিৎসাবিজ্ঞান: আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ মৃত্যুর কবল হতে ফিরে আসতে সমর্থ হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক রঞ্জনের আবিষ্কৃত 'রঞ্জন-রশ্মি' (X-Ray), কুরী ও মাদামকুরী আবিষ্কৃত 'রেডিয়াম' বিজ্ঞানজগতে যুগান্তর এনেছে। রঞ্জন রশ্মি এবং আলট্রাসনোগ্রাফীর সহায়তায় শরীরের অদৃশ্য বস্তু দৃশ্যমান হয়েছে। রেডিয়াম ক্যান্সারের মতো ভয়ঙ্কর ক্ষতের মারাত্মক বিষক্রিয়াকে অনেকাংশে প্রতিহত করেছে। পেনিসিলিন, ক্লোরোমাইসিন ও স্টেপটোমাইসিন ইত্যাদি মহৌষধ আবিষ্কারের ফলে কোটি কোটি মানুষ নানান প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হতে রক্ষা পাচ্ছে। লুই পাস্তুরের ইনজেকশন আবিষ্কৃত হওয়ার পর মানুষ জলাতঙ্ক রোগ থেকে রক্ষা পেয়েছে। দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধি বসন্তের জীবাণু নিবারণের জন্য ভ্যাক্সিন আবিষ্কার করেন এডওয়ার্ড জেনার। এমনিভাবে বিজ্ঞানের কল্যাণে আমাদের বহু অভাব দূরীভূত হয়েছে, আমরা আনন্দ লাভ করেছি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছি। সুতরাং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের অবদান যথেষ্ট।

উপসংহার: আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে এক হয়ে গেছে বিজ্ঞান। মানবকল্যাণে বিজ্ঞানের দানই শ্রেষ্ঠ। এজন্য বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর কাছে মানুষ চিরঋণী। বিজ্ঞানের দানে সত্যিই মানুষ বিশ্বজয়ী হয়েছে। সভ্যতার ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের তুলনা নেই। বিজ্ঞানকে বাদ দিলে আজ আমাদের বেঁচে থাকা দুরূহ। বিজ্ঞানকে যদি ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার না করে মানবকল্যাণে ব্যবহার করা যায়, তবে মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নতুন অধ্যায় সূচিত হবে।

৮. পরিবেশ দূষণ

[কু. বো. '০১: চ. বো. '০২] [মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা: ইসলামি এডুকেশনাল ট্রাস্ট (আইইটি) সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়; বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বান্দরবান]

অথবা, পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার

[ঢা. বো. '১৪, '১১, ০৫; রা. বো. '১২, '০৯; য. বো. '১৯, '১৫, '১২, '৩৫; কু. বো, '১৯, '১৭, '১৪; চ. বো. '১৯, '১৭, '১৪, '০৯; সি. বো, '১৭, '১৩, '১১; ব. বো. '১৭, '০২; দি. বো. '১৯; ম. বো, '২০]

"পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।" -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা: প্রাণের বিকাশের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এ সম্পর্ক যখন সহজ এবং স্বাভাবিক থাকে, তখন এর গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের কোনো সচেতনতা আসে না। প্রকৃতি ও মানুষের সৃষ্ট এবং জাগতিক পরিবেশের অভিপ্রেত সাম্যাবস্থা বজায় থাকলে চিন্তার কোনো কারণ থাকে না। কিন্তু যখন সেই সাম্যাবস্থায় ফাটল ধরে, তখন আর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলে না। জীবনকে উন্নত করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান যখন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করল, অমনি পরিবেশ আর আগের মতো রইল না। দূষিত হতে শুরু করল পরিবেশ। আজ এই পরিবেশ দূষণে সমগ্র জীবজগতের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে। নির্বিচারে প্রকৃতি' সংহার এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন আবহাওয়া দূষিতকরণের মধ্যদিয়ে মানুষ পৃথিবীতে ডেকে এনেছে ক্ষয় ও অবক্ষয়ের মহামারি। বাংলাদেশেও একই অবস্থা বিরাজমান।

পরিবেশ দূষণের স্বরূপ: পরিবেশ আমাদের কাছে জীবনদাত্রীর মতো। পরিবেশ থেকে আমরা জীবনধারণের নানা উপকরণ সংগ্রহ করি। যে অক্সিজেনের অভাবে আমাদের প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা, তা এই পরিবেশই আমাদের সরবরাহ করে। যে খাদ্যগ্রহণ করে আমরা বেঁচে থাকি, তা এই পরিবেশেরই দান। কিন্তু মানবজীবনের বিপুল চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে আমরা যখন বন কেটে বসত তৈরি করি, কারখানা গড়ি, সড়ক বানাই, রেল লাইন পাতি, অমনি পরিবেশ বদলে যায়, প্রকৃতির সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হতে থাকে। আমাদের জীবনযাত্রায় আজ একদিকে বিজ্ঞানের বিজয় গৌরব, অন্যদিকে দূষণের দুঃস্বপ্ন। পরিবেশ দূষিত হয় প্রধানত বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ ও পারমাণবিক দূষণের মাধ্যমে। জনসংখ্যা বৃদ্ধিও পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে কম ভূমিকা রাখে না। মোটকথা, পরিবেশ দূষণের জন্য একটি দুটি কারণ নয়, অগণিত কারণ বিদ্যমান।

বায়ু দূষণ: প্রাচীনকালে যখন আগুন আবিষ্কৃত হয়, তখন থেকেই প্রাণের ধাত্রী অক্সিজেনের ধ্বংসলীলা সূচিত হয়। আগুন বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের অনুপাত হ্রাস করে জীবনের অনুকূল পরিবেশের ভারসাম্যই শুধু নষ্ট করে নি, ধোঁয়া এবং ভস্মকণায় তাকে করে তুললো কলুষিত। অরণ্য কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে প্রাণ প্রদায়ী অক্সিজেন ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু মানুষ নগর জনপদ গড়ে তোলার প্রয়োজনে নির্বণীকরণের জন্য কঠোর হাতে গ্রহণ করে নিষ্ঠুর কুঠার। ফলে, অক্সিজেন পরিশোধনের রূপকার অরণ্যকে সংকুচিত করে মানুষ প্রকারান্তরে নিজেই নিজের অস্তিত্ব বিলোপের চক্রান্তে শামিল হলো।

যানবাহনও বায়ু তথা পরিবেশকে নানাভাবে দূষিত করে। গাড়ি যখন চলে তখন অক্সিজেনের সঙ্গে কার্বনের দহনে শক্তি উৎপন্ন হয়। দহনকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের সঙ্গে আরও কতকগুলো গ্যাস নির্গত হয়ে থাকে। নির্গত গ্যাসগুলোর মধ্যে বিষাক্ত কার্বন-মনো-অক্সাইড গ্যাসও থাকে। কলকারখানার ক্ষেত্রে যে দূষিত পদার্থ কালো চুল্লী দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে বাতাসকে বিষাক্ত করে তোলে, তার পরিণতির কথা ভাবলে যেকোনো সুস্থ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে ওঠবেন।

বায়ুদূষণ প্রসঙ্গে আর একটি দিকের কথা উল্লেখ করতে হয়। তা হলো ধোঁয়াশা। শীতকালে ঠান্ডা হাওয়ায় বাতাসের জলীয়বাষ্পের ঘনীভূত রূপ বাতাসের ধূলিকণা ও কার্বনের কণাকে অবলম্বন করে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে। যে বাতাসে আমরা শ্বাস গ্রহণ করি, সেই বাতাসই যদি দূষিত হয়ে পড়ে, স্বাভাবিকভাবেই তা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়। আজ বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, মাথাধরা, শ্বাসরোগ, হাঁপানি, ফুসফুসে ক্যান্সার প্রভৃতি রোগ যে ক্রমবর্ধমান, তার মূল কারণ বায়ু দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি। গ্রামের মানুষও আজ বায়ু দূষণ থেকে মুক্ত নয়।

পানি দূষণ: শিল্প উৎপাদনে নিয়োজিত বিভিন্ন ধরনের কারখানায় নানারকম রাসায়নিক ও বর্জ্য বস্তু নিয়মিতভাবে নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়। শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ নদীর পানিকে কতটা দূষিত করে, সঠিক বিচারে তা বলা শক্ত। তার উপরে গৃহস্থের উচ্ছিষ্ট এবং পৌর কর্পোরেশনের আবর্জনা সেই দূষণক্রিয়াকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। লঞ্চ, জাহাজ থেকে নির্গত তেলও পানি দূষণের একটি অন্যতম কারণ। শুধু নদীর পানি নয়, গ্রামের পুকুর, খাল-বিলের পানিও নানা কারণে দূষিত হয়। পানি দূষণ আধুনিক সভ্যতার এক অভিশাপ। গ্রামে নদীর পানিতে, পুকুরে প্রচুর আবর্জনা ফেলা হয়, পাট পচানো হয় ফলে পানি দূষিত হয়।

শব্দ দূষণ: বায়ু দূষণ ও পানি দূষণের সাথে সাথে শব্দ দূষণের কথাও উল্লেখ করতে হয়। শহরে শব্দ দূষণের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। রাস্তায় বাস, ট্রাক, ট্যাক্সির হর্ন, কলকারখানার আওয়াজ, বোমাবাজি, মাইকের চিৎকার, মিছিলের ধ্বনি প্রতিধ্বনি এসবই স্বাভাবিক পরিবেশকে নষ্ট করে আমাদের পারিপার্শ্বিক শান্তিকে বিঘ্নিত করছে। দীর্ঘকাল এ ধরনের দূষিত শব্দের পরিমণ্ডলে থাকলে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের অবনতি ঘটে, মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হয়, স্নায়ুরোগের লক্ষণ দেখা দেয়। বর্তমান সময়ে গ্রামেও মাইকের উৎপাত খুব বেড়েছে।

পারমাণবিক বোমা ও পরিবেশ দূষণ: বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়েছে পারমাণবিক যুগ। কাঠ, কয়লা এবং তেল দহনের ফলে বায়ুমণ্ডল যে পরিমাণে দূষিত হয়, পারমাণবিক দহনে দূষণের পরিমাণ তারচেয়ে কয়েক লাখ গুণ বেশি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম বর্ষে পারমাণবিক বোমাবর্ষণের ফলে শুধু জাপানের হিরোশিমা নাগাসাকিই ধ্বংস হয় নি, তার প্রবল প্রতিক্রিয়ায় সন্নিহিত ভূখণ্ডের মানুষ, জীবজন্তু এবং উদ্ভিদের সুদ্ধ অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়ে। পরীক্ষামূলকভাবে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে বায়ুমণ্ডলকে যে পরিমাণে বিষাক্ত করে তোলা হয়, বায়ুমণ্ডলকে সেই পরিমাণে বিষমুক্ত করে তার পরিশোধনের বিন্দুমাত্র প্রয়াস নেই। তাছাড়া, প্রচণ্ড শক্তিশালী রকেটের সাহায্যে মহাকাশ অভিযানেও উপগ্রহ উৎক্ষেপণে যে পরিমাণ বিষাক্ত গ্যাস পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে নিক্ষেপ করা হয়, তাতেও আবহাওয়া দূষিত করে চলেছে পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো।

মৃত্তিকা দূষণ: অধিক ফসল ফলানোর জন্য এবং কীট-পতঙ্গের হাত থেকে ফসলকে রক্ষার জন্য কৃষকেরা অপরিকল্পিতভাবে জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করছে। এতে মৃত্তিকা দূষণের সাথে সাথে জীবজগতে বিপন্ন অবস্থা দেখা দিয়েছে।

প্রতিকারের উপায়: পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের জন্য জনবসতি ও সভ্যতার সম্প্রসারণের প্রয়োজনে নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংস বন্ধ করতে হবে। অরণ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব না হলেও, যেখানে সুযোগ আছে, সেখানেই গাছ লাগানো প্রয়োজন। যানবাহন থেকে নির্গত বিষাক্ত পদার্থযুক্ত কালো ধোঁয়া যাতে বন্ধ করা যায়, তার জন্য পুরোনো ইঞ্জিনচালিত গাড়ির চলাচল নিষিদ্ধ হওয়া দরকার। এ বিষয়ে সরকারি সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি। শহর বা জনবসতির কাছাকাছি কলকারখানা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তার চুল্লীগুলোর মুখও থাকা উচিত ভূমি থেকে অনেক ওপরে। কলকারখানা থেকে দূষিত পদার্থ নির্বিচারে নদীতে না ফেলাই সমীচীন কিংবা এগুলো ফেলার আগে প্রয়োজনমতো শোধন করে নেওয়া উচিত। সেই সঙ্গে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে রকেট নিক্ষেপণ ও পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ হওয়া চাই। শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণও কঠিন কাজ নয়। ইলেকট্রিক বা হাইড্রোলিক হর্ন, মাইকের যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করলেই সে উদ্দেশ্য অনেকাংশে সিদ্ধ হয়।

ককটেল, বোমা ও গ্র্যান্ডে বিস্ফোরণের শব্দ ও ধোঁয়া একইসাথে শব্দদূষণ ও বায়ু দূষণ করে। অবিলম্বে আইন করে এগুলো তৈরি, বিক্রি ও ব্যবহার বন্ধ করা জরুরি। অপরিকল্পিতভাবে জমিতে যে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হয়, সে সম্পর্কে অশিক্ষিত কৃষকদের সচেতন করতে হবে। অতিরিক্ত কয়লা ব্যবহার হ্রাস করে বায়ুমণ্ডলের দূষণ প্রতিরোধ অবিলম্বে সূচিত হওয়া দরকার। তাহলেই পরিবেশ দূষণ অনেকাংশে কমিয়ে আনা যাবে।

উপসংহার: একদিকে আধুনিক জীবনযাত্রার প্রয়োজন, অন্যদিকে পরিবেশ দূষণ রোধ উভয় দিকে লক্ষ রেখে চলা সহজ কথা নয়। তবু মানবজাতি সচেতন হলে এবং সমাজব্যবস্থা সহায়তা করলে, পরিবেশ দূষণের অবসান ঘটানো না গেলেও তাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে, এমন আশা করা অসংগত নয়। আজ আর পরিবেশ দূষণ নয়, চাই তার বিশুদ্ধকরণ।

৯. পরিবেশ সংরক্ষণে বনায়ন

[ঢা. বো. '০৭; য. বো. '১০, '০৭, '০৪; কু. বো, '০৬; চ. বো. ২০০০; সি. বো. '১৯; ব. বো. '১১, '০৮]

[কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কক্সবাজার]

"গাছের ছায়ায় বসে বহুদিন কাটিয়েছি
কোনদিন ধন্যবাদ দিই নি বৃক্ষকে
এখন একটা কোন প্রতিনিধি বৃক্ষ চাই
যার কাছে সব কৃতজ্ঞতা
সমীপেষু করা যায়।" - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ভূমিকা: বন প্রকৃতি মানুষের নিকটতম প্রতিবেশী। বনভূমিই পৃথিবীর প্রথম আগন্তুক। অরণ্য তার অবারিত শ্যামল ছায়া বিস্তার করে তাকে সূর্যের প্রখর দহনজ্বালা থেকে রক্ষা করেছিল। তার ক্ষুধার্ত মুখে অরণ্যই দিয়েছিল খাদ্য, প্রকৃতির নানা বিরুদ্ধ শক্তির হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য দিয়েছিল নিরাপদ আশ্রয়। গভীর অরণ্যের বুকে মানুষ গড়ে তুলেছে চঞ্চল জনপদ। জীবন স্পন্দনে অপূর্ব কোলাহলমুখর সে জনপদ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিস্তৃত হয়েছে। মাঠে মাঠে ফসলের দোলা, কর্মের সমারোহ, আনন্দের জয়ধ্বনি জেগেছে। কৃষি সভ্যতার বুনিয়াদ মজবুত হয়েছে। প্রয়োজন বেড়েছে মানুষের। বনের গাছ কেটে মানুষ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তৈরি করেছে, ঘরের খুঁটি দিয়েছে। জীবিতকালে গাছ ফুলের সুবাস দেয়, ফল দেয়, অক্সিজেন দেয়, মরণের পরেও সে নানানভাবে মানুষের উপকার করে যায়। পরিবেশ সংরক্ষণে বনায়নের মতো এমন উপকারী আর কিছু নেই।

বনায়নের উদ্দেশ্য: মানুষ আজ অরণ্য বিনাশের মাধ্যমে পৃথিবীতে ডেকে আনছে মরুভূমি। অরণ্যই মরুভূমিকে প্রতিরোধ করতে পারে, অরণ্যই মরুভূমিকে শ্যামল স্নিগ্ধ স্নেহময়ী জননীর মূর্তি দান করতে পারে। বনায়নের মাধ্যমে সম্ভব হয় পরিবেশ সংরক্ষণ ও মরুভূমির বশীকরণ। বনায়নের উদ্দেশ্যই হলো তাই। অরণ্যের তরুশিশুদলকে মানবসমাজের সান্নিধ্যে আহ্বান করাই তার মূল উদ্দেশ্য। জনভূমি ও বনভূমির মধ্যে একদিন ব্যবধান ছিল না। পাশ্চাত্য সভ্যতার নগরকেন্দ্রিকতা অরণ্যকে ধ্বংস করে তার ওপর ইট কাঠ পাথরের কৃত্রিম শোভা স্থাপন করে প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির কবরভূমি রচনা করেছে। বনায়নের উদ্দেশ্য এই কবরভূমি থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করে একটা সুন্দর পরিবেশ উপহার দেওয়া। তাই কবি বলেছেন-

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,"

বনভূমি ও মানবজীবন: মানবজীবন ও অরণ্যজীবন- প্রাণের এই দুই মহান প্রকাশের মধ্যে বাজে একটিমাত্র ছন্দ। ঋতুচক্রের আবর্তনের পথে উভয়ের একই স্পর্শকাতরতা। বসন্তের দক্ষিণ বাতাসে মানুষ তার হৃদয়ের আনন্দানুভূতিকে চিত্রে, সংগীতে কিংবা কবিতায় প্রকাশ করে। আর অরণ্য তার বাসন্তী বেদনাকে প্রকাশ করে অশোক, পলাশ, কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম প্রগলভতায়। উভয়ের আদান প্রদানের সম্পর্কও অতি নিবিড়। এক বিপুল ভ্রান্তিবিলাসের জন্য মানুষ এতদিন তার পরম বন্ধুকে চরম শত্রু মনে করে নির্বোধ ঘাতকের মতো ধ্বংসের পৈশাচিক লীলায় মেতে ওঠেছিল। কাজেই, আজ আর বনভূমি ধ্বংস নয়, বনভূমি সৃজনই প্রয়োজন।

বাংলাদেশের বনভূমি: বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি বনায়নের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন আছে। যেমন: গাজীপুর জেলার অন্তর্গত ভাওয়ালের গজারি বন, টাঙ্গাইলের মধুপুরের বন, খুলনা বিভাগের অন্তর্গত সুন্দরবন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি, কুমিল্লার শালবন বিহার ইত্যাদি। এককালে এসব বনাঞ্চল বড় বড় গাছপালায় পরিপূর্ণ ছিল। বর্তমানে বনভূমি প্রায় উজাড় হওয়ার পথে। এতে পরিবেশগত দিক থেকে বাংলাদেশ ভীষণ সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

পরিবেশ ও সামাজিক বনায়ন: পরিবেশ নিঃসন্দেহে মানবধাত্রীর মতো। প্রকৃতি ও মানবচরিত্রের মধ্যে বিরোধ নয়, উভয়ের মধ্যে রয়েছে গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক। এই সম্পর্ককে আরও গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে বিশুদ্ধ পরিবেশ দরকার। তাই পরিবেশ সংরক্ষণের জন্যও বাংলাদেশে বনায়নের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সামাজিকভাবে বনায়ন কর্মসূচি সফল করতে না পারলে মানুষের উপযোগী পরিবেশ সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। আমরা জানি, প্রাকৃতিক ভারসাম্যের জন্য ২৫ শতাংশ বনভূমি আবশ্যক, কিন্তু বাংলাদেশে বর্তমানে আছে মাত্র ১৩.৪৬ শতাংশ বনভূমি। আমাদের পরিবেশ ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বনায়ন বৃদ্ধি করা উচিত। তা না হলে আমরা গ্রীন হাউস এফেক্ট-এর করালগ্রাস থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারব না। বৈজ্ঞানিকদের সমীক্ষায় জানা গেছে যে, গ্রীনহাউসের প্রভাবে বাংলাদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এক মিটার বৃদ্ধি পেতে পারে, আর তাতে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ২২,৮৮৯ বর্গকিলোমিটার এলাকা পানির নিচে ডুবে যেতে পারে। তাছাড়া আমাদের প্রাণিজগতের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান হলো অক্সিজেন। অক্সিজেন আমরা সাধারণত পেয়ে থাকি গাছপালা বা বনভূমি থেকে। আমাদের দেশের মানুষের জন্য যে পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন, সে পরিমাণ অক্সিজেন পাওয়ার মতো বনভূমি বাংলাদেশে নেই। তাই মানুষের বসবাসের উপযোগী পরিবেশ সংরক্ষণ ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার জন্য আমাদের বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা খুবই দরকার।

সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি সফল করতে হলে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন করতে হবে। বনায়নের জন্য যে শুধু বিশাল বনভূমিকেই বেছে নিতে হবে তা নয়, আমাদের বাড়ির আশেপাশে অনেক অনাবাদী জায়গা থাকে, পুকুরপাড়ে পড়ে থাকে অনেক জায়গা, এসব জায়গায় গাছপালা লাগিয়ে বনায়ন কর্মসূচি পালন করা যায়। তাছাড়া রাস্তার ধারে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশেপাশে ও খেলার মাঠের ধারেও গাছ লাগানো যায়। এসমস্ত কর্মসূচি শুরু হলে সামাজিকভাবে মানুষ উৎসাহিত হবে এবং বনায়নে এগিয়ে আসবে।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সফল করার উপায়: বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হলে প্রয়োজন পুরাতন গাছকে নির্বিচারে না কাটা এবং নতুন গাছের চারা লাগানো। নতুন করে গাছ লাগাতে বা রোপণ করতে হলে প্রয়োজন চারার। সকল ধরনের গাছের চারা সংগ্রহ করা খুবই কঠিন কাজ।

কারণ, গাছের চারা কোনোটা হয় ফল থেকে, কোনোটা বীজ থেকে, আবার কোনোটা হয় ডাল থেকে কলমের মাধ্যমে। এরূপ চারা সাধারণ মানুষের পক্ষে সংগ্রহ করা কঠিন কাজই বটে। তাই এই সংগ্রহের কাজ করতে হবে সরকারের নিজস্ব বিভাগগুলোকে। সরকার যদি এই চারা সংগ্রহ করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করে, তা হলে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সফল করা সম্ভব। তাছাড়া গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে, উৎসাহিত করতে হবে। বনাঞ্চল কমে যাওয়ার পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য পরিকল্পিত উপায়ে বৃক্ষরোপণ করে সমস্যার সমাধান করতে হবে। চারা রোপণের নিয়ম-কানুন ও পরিচর্যা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে জনগণকে অবহিত করতে হবে। সাম্প্রতিককালে বৃক্ষমেলা আয়োজনের মাধ্যমে গাছের চারা সবার কাছে সহজলভ্য হচ্ছে। প্রত্যেকের বাড়ির পাশের অনাবাদি জায়গায়, পুকুর পাড়ে, রাস্তার পাশে, স্কুলের পতিত জায়গায় বৃক্ষরোপণ করতে হবে। ছাত্র- শিক্ষকসহ সকল স্তরের জনগণের মধ্যে যদি বৃক্ষরোপণের উৎসাহ- উদ্দীপনা ও জাগরণ ঘটানো যায়, তাহলে বৃক্ষরোপণ অভিযান সফল হবে বলে আশা করা যায়।

বনায়নের উপকারিতা: বনভূমি সূর্যের প্রখর কিরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রকৃতির শোভাবর্ধন করে। প্রয়োজনীয় কাঠ সরবরাহ করে বনভূমি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদা মিটিয়ে থাকে।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে বনভূমির অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গাছপালা বায়ুর অঙ্গার কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নিজের খাদ্য তৈরি করে ও বিশুদ্ধ অক্সিজেন গ্যাস বাতাসে ছেড়ে দেয়। এই অক্সিজেন আমাদের জীবনধারণের জন্য একান্ত অপরিহার্য। গাছপালা না থাকলে বাতাসে, - কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেত এবং অক্সিজেনের অভাবে প্রাণী মারা যেত। একমাত্র গাছপালা বা বনায়নই আমাদের জীবনধারণের সুদ্ধ পরিবেশের নিশ্চয়তা দান করে। তাছাড়া গাছপালা শুধু ছায়া ও শোভাই বিস্তার করে না, ফুল, ফল দান করে এবং প্রয়োজনীয় কাঠ সরবরাহ করে আমাদের অনেক উপকার করে থাকে। গাছ আমাদের উপাদেয় খাদ্য ও অর্থকরী ফল সরবরাহ করে থাকে। তাই বনায়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

উপসংহার: আজ আর বনভূমি ধ্বংন নয়, বনভূমি সৃজনই প্রয়োজন। স্নিগ্ধ, শীতল ছায়া এবং প্রাণের উৎস অম্লজান থেকে আরম্ভ করে খাদ্য, বাসগৃহ, ঔষধপত্র পর্যন্ত সবই অরণ্যের অবদান। অরণ্য ছাড়া পৃথিবী পরিণত হতো মরুভূমিতে। অরণ্যই প্রাণের অগ্রদূত। বিজ্ঞাননির্ভর যান্ত্রিক সভ্যতার ক্রমবিস্তার এবং অরণ্য সংহারে প্রাকৃতিক আবহাওয়ার যে ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এখন বনায়নই তার একমাত্র প্রতিকার।

১০. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও তার প্রতিকার

[ঢা. বো. '১৫, '০৮, '৩৫; রা. বো. '০৮, '০১; য. বো. '১০, '০৯; চ. বো. '১৩, '০১; ব. বো. '১৩; দি. বো, '২০, '১৩] [কুল্লা ক্যাডেট কলেজ, কুমিল্লা: আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা; মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, মিরপুর, ঢাকা; সারদাসুন্দরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদপুর; সরকারি পিএন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী; মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর; কুমিলা মডার্ন হাই স্কুল, কুমিল্লা; ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম: ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর: দি মিলেনিয়াম স্টারস স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর: বরগুনা জিলা স্কুল, বরগুনা; গাইবান্ধা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গাইবান্ধা: গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ময়মনসিংহ; রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর]

ভূমিকা: বাংলাদেশ মৌসুমি বায়ুর দেশ। মৌসুমি বায়ুর জন্য বাংলাদেশে ছয়টি ঋতুর আবির্ভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই ষড়ঋতুর জন্য বাংলাদেশ পৃথিবীর অকৃত্রিম প্রাকৃতিক লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আবার মৌসুমি বায়ুর কারণেই এই শ্যামল সুন্দরের লীলাক্ষেত্র পরিণত হয়েছে শ্মশানে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানটাই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি। আমাদের দেশের দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। তারই প্রভাবে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, টর্নেডো, সাইক্লোন বা জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা ও মহামারীতে দেশের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী। বাংলাদেশে সাধারণত যে সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যায়, নিচে তার বর্ণনা দেওয়া হলো-

কালবৈশাখি: বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছরই নানা দুর্যোগ সংঘটিত হয়ে থাকে। কালবৈশাখির ফলে বাংলার বহু এলাকা বিধ্বস্ত হয়। ঝড়ের তাণ্ডবলীলায় গাছপালা, ঘরবাড়ি ভেঙে যায়। মারা যায় হাজার হাজার গরু বাছুর, পাখপাখালি, মানুষ হয় অসহায়। কিছুদিন পূর্বে এমনি এক কালবৈশাখির শিকার হয়েছিল মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ার জনসাধারণ। ১৯৮৯ সালে সুন্দরবন এলাকা, ১৯৯১ সালে গাজীপুর এবং ১৯৯৬ সালে টাঙ্গাইলের অনেক থানা বিধ্বস্ত হয়েছে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে। নিশ্চিহ্ন হয়েছে বহু গ্রামগঞ্জ। প্রায় প্রতিবছরই বাংলাদেশের কোনো না কোনো অঞ্চলের ওপর দিয়ে এরকম কালবৈশাখি বয়ে যায়।

বন্যা: বন্যাও বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের রূপ নিয়ে দেখা দেয়। ছোটখাট প্লাবনকে আমরা বলে থাকি বর্ষা। আর সেই প্লাবন যখন বিশাল আকার ধারণ করে তখন তাকে বন্যা বলা হয়। প্রায় প্রতিবছর বাংলাদেশে বন্যা দেখা দেয়। দেশের নিম্নাঞ্চল বন্যার পানিতে ভেসে যায়। কোনো কোনো বছর তা ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। ধ্বংস হয় শত শত গ্রাম। মারা যায় গরু, বাছুর, মানুষ। নষ্ট হয় হাজার হাজার একর জমির ফসল। ১৯৭৪, ১৯৮৭ সালের বন্যায় আমাদের দেশের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়েছিল। ১৯৮৮ সালের বন্যা ছিল বাংলাদেশের স্মরণকালের ভয়াবহতম বন্যা। যার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা কঠিন হয়ে পড়েছিল। ১৯৯৮ সালের বন্যায়ও কম ক্ষতি হয় নি। ২০০৩ সালের বন্যায়ও কোনো কোনো অঞ্চলে অনেক ঘরবাড়ি এবং ফসলের ব্যাপক। ক্ষতি হয়েছে। বন্যা বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

সাইক্লোন বা জলোচ্ছ্বাস: সাইক্লোন বা জলোচ্ছ্বাস বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রায় বছরই জলোচ্ছ্বাস হয়। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, বিগত ১৮৫ বছরে বাংলাদেশে ৫১ বার সাইক্লোন সংঘটিত হয়েছে। ১৯৭০ সালের সাইক্লোন জলোচ্ছ্বাস সবাইকে হতবাক করে দেয়। সেই ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ছিল আড়াইশ কিলোমিটার।

রুদ্র কালনাগিনীরূপে ধ্বংসযজ্ঞ চলায় পাঁচ লাখেরও বেশি লোক মারা যায় জলোচ্ছ্বাসের ছোবলে। ১৯৮৫ সালেও বাংলাদেশের দক্ষিণের দ্বীপাঞ্চলে হানা দেয় সর্বনাশা সাইক্লোন। সাইক্লোনের প্রচণ্ড আঘাতে উড়ির চর এলাকা বিধ্বস্ত হয়। এ সময়ে প্রায় দেড় লাখের মতো লোক প্রাণ হারায় এবং ধ্বংস হয় জমির ফসল ও অসংখ্য ঘরবাড়ি। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে সংঘটিত হয় স্মরণকালের আরও এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। বাংলাদেশের ১৬টি জেলার প্রায় ৪৭টি থানা বিধ্বস্ত হয়। ২০ হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে এই ঝড় হ্যারিকেনের রূপ নিয়ে ২০ ফুটেরও বেশি উচ্চতায় জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে। ঐ প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাসে প্রায় পাঁচ লাখ লোক মারা যায়। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকার সম্পদ এই দানবীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিনষ্ট হয়েছে। সম্প্রতি আইলা, সিডর প্রভৃতি দুর্যেঅগে এ ক্ষতির পরিমাণ আরো বেশি হয়।

টর্নেডো : বাংলাদেশে প্রায় বছরই টর্নেডো বা আকস্মিক ঘূর্ণিবায়ু মারাত্মকভাবে আঘাত হানে। ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে স্মরণকালের ইতিহাসে ভয়াবহতম টর্নেডো আঘাত হানে বাংলাদেশের নেত্রকোনা জেলা ও তার আশেপাশের জেলাগুলোতে। এতে বহু প্রাণহানি ঘটে। ধ্বংস হয় অসংখ্য ঘরবাড়ি। বিনষ্ট হয় হাজার হাজার গবাদিপশু।

লবণাক্ততা : লবণাক্ততাও একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় জমিতে প্রায় সময়ই লবণাক্ততা দেখা দেওয়ার ফলে ব্যাপকভাবে ফসলের ক্ষতি হয়।

শিলাবৃষ্টি: শিলাবৃষ্টি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর একটি। প্রায় বছরই ব্যাপক শিলাবৃষ্টি হয়। ফলে বিভিন্ন প্রকার ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিশেষ করে ইরি ধানের মৌসুমে শিলাবৃষ্টি হলে কৃষকের দুঃখ-দুর্দশার সীমা থাকে না। চারা অবস্থায় শিলাবৃষ্টি হলে ধানের ফলন অনেক কম হয়। ধান বের হবার পর শিলাবৃষ্টি হলে ধান চিটা হয় এবং ঝরে যায়।

ভূমিকম্প: বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় প্রতিবছর ভূমিকম্প হয়। এতে কিছু পরিমাণ জনজীবন বিপর্যস্ত হয় এবং দালান কোঠা, ঘরবাড়ি ধসে যায়। অনেক সময় ধ্বসে যাওয়া ঘরবাড়ির নিচে চাপা পড়ে মানুষ ও গরু ছাগল প্রাণ হারায়।

নদীভাঙন : নদীভাঙন বাংলাদেশের একটি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। দেশের অনেক এলাকা নদীভাঙনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন- পদ্মার তীরে বসবাসকারী লোকেরা নদীভাঙনের ফলে অনেকক্ষেত্রে সর্বস্ব হারিয়ে রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়। যমুনা নদীর ভাঙনেও অনেক পরিবার সর্বস্ব হারা হচ্ছে।

খরা : কৃষিপ্রধান দেশে খরা বা অনাবৃষ্টি একটি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশে প্রায় বছরগুলোতেই খরা বা অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। যে বছরগুলোতে খরা বা অনাবৃষ্টি দেখা দেয়, সে বছর প্রায় সবরকম ফসলেরই ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। খরা বা অনাবৃষ্টি বাংলাদেশের জন্য একটি মারাত্মক ক্ষতিকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

অতিবৃষ্টি : কৃষিপ্রধান দেশে অতিবৃষ্টির ক্ষতিকর দিক কম নয়। বাংলাদেশে প্রায় বছরই অতিবৃষ্টির প্রকোপ দেখা দেয়। অতিবৃষ্টির ফলে ফসলের জমি পানিতে ডুবে যায়, কিংরা জমি থেকে পানি নিষ্কাশন দেরিতে হয়। এতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে।

দুর্যোগ মোকাবেলার উপায়

বিভিন্ন উপায়ে এসব দুর্যোগ মোকাবিলা করা যায়। দুর্যোগ মোকাবিলার প্রধান প্রধান উপায়গুলো নিম্নরূপ :

১. দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীবাহিনী গঠন করা।

২. জাতীয় ভিত্তিতে দুর্যোগ মোকাবিলা করার নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করা।

৩. জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা।

৪ . পরীক্ষিত পদ্ধতির ভিত্তিতে যথাসময়ে সতর্কবাণী দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

৫. দুর্যোগ ঘটার পর দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের ব্যবস্থা করা।

৬. তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থাকে উন্নত করা।

৭. দুর্যোগপূর্ণ এলাকাতে আশ্রয়স্থল গড়ে তোলা।

৮. বেসামরিক ও সামরিক বাহিনীকে কাজে লাগানো।

৯. বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে কাজে লাগানো।

১০. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনকে কাজ করার সুযোগ দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং

১১. শিক্ষার মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

উপসংহার: দুর্যোগ সব সময়ই মানবতার জন্য বিপদ ডেকে আনে। তাই যেকোনো দুর্যোগের সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া মানবতার কাজ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশ সরকার অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ফলে আমরা ভবিষ্যতে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সময়োপযোগী দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণে সক্ষম হতে পারব।

১৩. শ্রমের মর্যাদা

[সকল বোর্ড '৯৭; ঢা. বো. '১৬, '১৫, '১৪, '০২; রা. বো, '২০, '১৯, '১২, '১০, '০৬; য. বো. '২০, '১৭, '১৩, '০৪; কু. বো, '১৪, '১২; চ. বো. '২০, '১৪, '১১, '০৮; সি. বো. '১৭, '১৩, '০৯, ০৬; ব. বো, '১২, '০৯, '০৬; দি. বো. '১২] [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা; মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা; বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বান্দরবান]

"বিশ্বপিতার মহা-কারবার এই দিন দুনিয়াটা
মানুষই তাহার মহামূল্যবান, কর্ম তাহার খাটা।" -যতীন্দ্রমোহন বাগচী

ভূমিকা: এই বিশাল পৃথিবী বিশ্ববিধাতার মহাকারখানা। এখানে সকলকে সাধ্যমত পরিশ্রম করতে হয়, শ্রম দিতে হয়। সবাইকে যে যার ক্ষমতা অনুসারে সাজাতে হয় পরিশ্রমের অনবদ্য উপাচার। তাতেই সভ্যতার সৌধ হয়ে ওঠে অপরূপ। সভ্যতার এ চরম বিকাশের মূলে আছে যুগ-যুগান্তরের লক্ষ-কোটি মানুষের অফুরন্ত শ্রম। বহু মানুষ তাদের বহুদিনের শ্রম দান করে তিলে তিলে গড়ে তুলেছে সভ্যতার এই অনবদ্য তিলোত্তমা মূর্তি। তারা পাহাড় কেটে পথ প্রস্তুত করেছে, সেতু বন্ধনে বেঁধেছে নদীর উভয় তটভূমিকে, নির্মাণ করেছে প্রাসাদ অট্টালিকা। কেউ ফলিয়েছে সোনার ধান, কেউ বুনেছে লজ্জা নিবারণের বস্ত্র, কেউ বা জীবনকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য রচনা করেছে সৌন্দর্যমণ্ডিত, শিল্প সৌকর্যময় নানা দ্রব্যসামগ্রী। সকলের পরিশ্রম বা শ্রমের যৌথ প্রয়াসে সম্ভব হয়েছে সভ্যতার এ অনবদ্য বিকাশ। সভ্যতা মানুষের শ্রমেরই সম্মিলিত যোগফল।

শ্রমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা: মানবজীবনে শ্রমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ছোট হোক বড় হোক সকলেরই কাজের প্রয়োজন আছে এবং যার যার দায়িত্ব যথাযথ পালনের মধ্যে জীবনের সুখকর অস্তিত্ব নির্ভরশীল। জীবনের উন্নতির চাবিকাঠি পরিশ্রমের মধ্যে বিদ্যমান। শ্রমের এই অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনায় শ্রমের মর্যাদা দিতে হবে। আজকের বিশ্বের বিপুল অগ্রগতির পেছনে যেমন শ্রমজীবী মানুষের অবদান রয়েছে, তেমনি শ্রমজীবী সমাজের অসহযোগিতা জীবনকে বিষময় করে তুলবে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, শ্রমের প্রতি তারা মর্যাদাশীল বলে তাদের উন্নতি এত ব্যাপক হয়েছে। সেসব দেশে ছোট বড় বলে কোনো পার্থক্য নেই। কাজ যাই হোক না কেন তাতে কোনো অমর্যাদা লুকিয়ে থাকে না। কায়িক বা দৈহিক পরিশ্রম সেসব দেশে কখনো কোনো অগৌরব নিয়ে আসে না। তাই সকলেই সব রকম কাজের প্রতি সমান আগ্রহ দেখিয়ে থাকে। জীবনের সাথে শ্রমের একটা নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।
মানবজীবনে শ্রমের এই বিশেষ গুরুত্ব দেখাতে গিয়ে কবি বলেছেন
"চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল,
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারি' পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।"
শ্রমের প্রকারভেদ: শ্রম প্রধানত দু প্রকার দৈহিক বা কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রম। মানবসমাজে দু ধরনের শ্রমেরই মূল্য আছে। যারা দেহ খাটিয়ে পরিশ্রম করে, তাদের শ্রমকে দৈহিক বা কায়িক শ্রম বলে। আর যে শ্রমে বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাভাবনাকে কাজে লাগানো হয়, তাকে বলে মানসিক শ্রম। জীবন পথে চলতে গেলে উভয় প্রকার শ্রমেরই প্রয়োজন রয়েছে।
ভাগ্যরচনা ও প্রতিভা বিকাশে শ্রম: মানুষ একদিকে যেমন সভ্যতার স্রষ্টা, অন্যদিকে তেমনি নিজের ভাগ্যেরও নির্মাতা। নিজের ভাগ্যকে মানুষ নিজেই নির্মাণ করতে পারে। তার ভাগ্য নির্মাণের হাতিয়ার হলো তার পরিশ্রম। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে সুপ্ত প্রতিভা। পৃথিবীতে যে সকল ব্যক্তি প্রতিভাবান বলে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন, তাঁরা আজীবন করেছেন কঠোর পরিশ্রম এবং তার ফলে তাঁদের প্রতিভা ফুলের মতো বিকশিত হয়ে পৃথিবীকে বিতরণ করেছে অনাবিল সৌরভ। পরিশ্রমই মানুষের প্রতিভা বিকাশ ও ভাগ্য গঠনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। শ্রমের এই গুরুত্ব বিবেচনা করেই পাশ্চাত্য মনীষী Virgil বলেছেন, "The dignity of labour makes a man self-confident and high ambitious So, the evaluation of labour is essential."
শ্রমিক লাঞ্ছনা: সমাজের উঁচু স্তরের মানুষ যারা, তারা গ্রহণ করেছে সমাজের সম্মানের কাজ, গৌরবের কাজ। সমাজের সমস্ত সুখ-সুবিধা নিজেরা কুক্ষিগত করে তথাকথিত নিম্নশ্রেণির মানুষদের নিক্ষেপ করেছে ঘৃণা ও বঞ্চনার নীরন্দ্র অন্ধকারে। অথচ সেই শ্রমিকেরা চিরকাল মাঠে মাঠে বীজ বুনেছে, ফলিয়েছে সোনার ফসল, তাঁতি বসে তাঁত বুনেছে, জেলে ধরেছে মাছ। অথচ স্বার্থপর সমাজের কাছ থেকে তারাই পায় নি মানুষের মর্যাদা।
সকল ধর্মে শ্রমের মর্যাদা : সকল ধর্মেই শ্রমের মর্যাদাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলাম ধর্মে শ্রমের ও শ্রমিকের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে ও শ্রমিকদের ঘাম শুকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে কর্মবাদের কথা অর্থাৎ পরিশ্রমের মাধ্যমে সৎ উপার্জনের কথা বলা হয়েছে।

খ্রিষ্টধর্মে শ্রমহীন বেকার মানুষের মর্যাদা নেই। অন্যান্য ধর্মেও পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের অবস্থার পরিবর্তন অর্থাৎ উন্নতি। করার কথা বলা হয়েছে। শ্রমের প্রকারভেদ বড় কথা নয়। যে কোনো শ্রমেরই গুরুত্ব ও মর্যাদা সমান।

শ্রমের জয় : শ্রমিক সমাজ আজ বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানবিক শ্রমকে তার যোগ্য মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কালের যাত্রায় একমাত্র তারাই আজ সমাজের রথকে। গতি দিতে পারে, একমাত্র তারাই পারে সমাজে কর্মমুখরতার ঢেউ আনতে। তাই আজ শ্রমের জয় বিঘোষিত হচ্ছে দিকে দিকে। শ্রমিক দুনিয়ার প্রতি সকলের দৃষ্টি আজ আকৃষ্ট হয়েছে। দেশে দেশে আজ শ্রমিক সংঘ এবং শ্রমিক কল্যাণ স্বীকৃতি লাভ করেছে। সমাজ কাব্যে উপেক্ষিত এই শ্রমকে তার যোগ্য সম্মান না দিলে যে সমাজের উত্থান নেই, অগ্রগতি নেই- এ কথা আজ সারা বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে।.

বাংলাদেশে শ্রমের স্থান: বাংলাদেশে শ্রমবিভাগ ছিল প্রধানত বর্ণগত। যারা উঁচু বর্ণের তারা কোন কাজ করত না। নিচু বর্ণের লোকেরা দৈহিক বা কায়িক পরিশ্রমের কাজ করত। তাতে সমাজে একটা ধারণা জন্মেছিল যে, যারা শারীরিক পরিশ্রম করে তারা সমাজে সম্মানের পাত্র নয়। এভাবে কায়িক পরিশ্রম আমাদের দেশে অবজ্ঞা পায় এবং আমরা কর্মবিমুখ হয়ে পড়ি। এটাই আমাদের অবনতির মূল কারণ।

শ্রমের সুফল: পরিশ্রম ছাড়া সমাজের কোনো কাজই সম্পাদিত হতে পারে না। সমস্ত কাজই পৃথিবীর কাজ। পৃথিবীতে যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী, সে জাতি ও দেশ তত উন্নত। পৃথিবীর মানুষ হিসেবে সকল কাজই মানুষের করণীয়। তাতে যেমন কাজের কোনো জাতিভেদ নেই, যারা সেই কাজ করে তাদেরও কোনো জাতিভেদ নেই। সুতরাং পরিশ্রম করা মোটেই সম্মান হানিকর নয়। এতে ব্যক্তির আত্মোন্নয়ন যেমন হয়, তেমনি হয় দেশের কল্যাণ। কায়িক ও মানসিক উভয় প্রকার শ্রমের মাধ্যমেই ব্যক্তি এবং জাতি মাথা উঁচু করে চলতে পারে। জাতীয় উন্নয়নে শ্রমের গুরুত্ব অনেক। শ্রমবিমুখ জাতির পতন অনিবার্য। জগতের মহামনীষীরা সকলেই পরিশ্রম করেছেন এবং শ্রমের মর্যাদা দিয়ে গেছেন। জগতের এত যে কীর্তি স্থাপিত হয়েছে তার মূলে রয়েছে মানুষের চিন্তা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়। শ্রমকে ঘৃণার চোখে বিচার করলে দেশে উৎপাদনের জোয়ার আনা যায় না, জাতীয় সমৃদ্ধির স্বপ্ন রচনা করা যায় না। শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হলেই পরিশ্রমের প্রকৃত সুফল পাওয়া সম্ভব। তাই সকল প্রকার শ্রমেরই মর্যাদা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। তাহলে যারা শ্রম দেয় তারা আর শ্রমবিমুখ থাকবে না এবং দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

উপসংহার : জীবনের সর্বক্ষেত্রে শ্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের 'পরিশ্রমকে কোনো সমাজ কোনো কালেই তার যোগ্য মর্যাদা দেয় নি। যারা সত্যিকার অর্থেই জীবনে সম্মান পেয়েছেন তারা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, পরিশ্রমেই জীবনের প্রকৃত আনন্দ। পরিশ্রমই জীবনের অশেষ দুঃখ-কষ্ট হতে মানুষকে মুক্তির সন্ধান দেয়। তাই সকল প্রকার শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

১৭. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

[ঢা. বো, '১৭, '১৪, '১০; রা. বো. '১৪, '১২; কু. বো. '২০, '১৩, '১০, '০৬; চ. বো, '১২, '১০; ব. বো. '১২, '০৮; ম. বো. '২০]

ভূমিকা: মানুষ ভাবের বিনিময় করে ভাষার মাধ্যমে। এ ভাষার গুণেই পৃথিবীর সকল প্রাণী থেকে মানুষ স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। মানুষ তার হাসি-আনন্দ, দুঃখ-বেদনা সবকিছুই প্রকাশ করে ভাষার মাধ্যমে। মাতৃভাষা ছাড়া তৃপ্তি মিটিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করা যায় না।

মাতৃভাষার এ গুরুত্বের কথা ভেবেই পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় মাতৃভাষার মাধ্যমে। মাতৃভাষার ভেতর দিয়েই শিশুর মনে স্বদেশপ্রেমের সূত্রপাত ঘটে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। বিদেশি শাসকরা এ ভাষাকে যুগে যুগে পদানত, করতে চেয়েছে। তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে এদেশের মানুষ। করেছে ভাষা আন্দোলন। অনেক রক্ত ঝরেছে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে অকাতরে জীবন দিয়ে, তার বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলা ভাষার মর্যাদা। একুশে ফেব্রুয়ারি আজ 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃত।

ভাষা আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস: বাঙালির মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত যে আন্দোলন হয়েছে, তাকে ভাষা আন্দোলন বলা হয়। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়েছিল। সেখানে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে গৃহীত হয় উর্দু এবং ইংরেজি। বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা হিসেবে গ্রহণের দাবি জানান প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানসহ মুসলিম লীগের নেতারা এর বিরোধিতা করেন। ফলে ২ মার্চ ঢাকায় ফজলুল হক মুসলিম হলে এক সভায় বাংলা ভাষার পক্ষে 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। এই পরিষদ ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে এবং ছাত্ররা শোভাযাত্রা নিয়ে রাজপথে নামে। শোভাযাত্রায় পুলিশ নির্বিচারে গুলি ও লাঠিচার্জ করলে অনেক ছাত্র মারাত্মকভাবে আহত হয়। এর প্রতিবাদে ১৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন এবং ১৫ মার্চ পর্যন্ত এই ধর্মঘট অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রথম ঢাকায় আসেন। তিনি ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক জনসভায় ঘোষণা করলেন, "Urdu and only Urdu will be the State Language of Pakistan." এর প্রতিবাদে ২৬ মার্চ ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯৪৮ সালের ১৭ নভেম্বর ঢাকায় গঠিত হয় 'রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ'। ১৯৫০ সালে গণপরিষদে ভাষণ দিতে গিয়ে জিন্নাহকে অনুসরণ করে লিয়াকত আলী খান বললেন, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।" এর প্রতিবাদে ঢাকার রাজপথ গরম হয়ে ওঠে এবং ৩০ জানুয়ারি পালিত হয় ধর্মঘট। ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এক সভায় ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস পালন ও হরতালের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন ফরিদপুর জেলে অনশনরত। সরকার জনরোষের ভয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে এক মাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র ধর্মঘট, জনসভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারির ঘোষণা দেয়। কিন্তু ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে নামলে পুলিশ নির্মমভাবে গুলিবর্ষণ করে। পুলিশের গুলিতে শহিদ হন রফিক, জব্বার, সালাম, বরকত এবং নাম না জানা আরও অনেকে। শহিদদের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয় এবং ২১ ফেব্রুয়ারিকে
জাতীয় মর্যাদায় পালন করা হয় 'শহিদ দিবস' হিসেবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি: ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ফ্রান্সের প্যারিসে ইউনেস্কোর সাধারণ পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাঙালি জাতির জন্য এ এক বিরাট গৌরব। একদিকে সারা বিশ্বের মানুষ জানতে পারবে বাংলাদেশ নামে একটি দেশের কথা, বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার কথা, অন্যদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশের ভাষাগুলো মর্যাদা লাভের পথ খুঁজে পাবে। বলা যায়, ভাষার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এক বিরাট ভূমিকা পালন করবে।

মাতৃভাষা দিবসের আনন্দ উৎসব: মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি পাওয়ায় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাতৃভাষা দিবস উৎসবের আয়োজন করে ১৯৯৯ সালের ৭ ডিসেম্বর। উৎসবটি পালিত হয় ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে। 'একুশ আমাদের অহংকার', 'একুশ পৃথিবীর অলঙ্কার', 'অমর একুশ অজয় হয়েছে'-এরকম অজস্র কথা, কবিতা, গদ্য, নৃত্যছন্দে জমজমাট আনন্দ উৎসবের মধ্যে পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি উপলক্ষে দিনভর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আনন্দ, শোভাযাত্রা, আলোচনা, নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজধানী ঢাকা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পালিত হয় এ উৎসব।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন : ২০০০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটি স্মরণীয় দিন। বাংলা ভাষাকে জাতীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে যাঁরা জীবন দিয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সারা দেশের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ ছুটে যায় শহিদ মিনারে। জাতিসংঘের মহাসচিব এ দিবসটি পালন উপলক্ষে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কাছে বার্তা প্রেরণ করেন। বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবারই প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটি উদযাপন করে। তাই বাংলাদেশের ইতিহাসে এ দিনটি অব্যয় ও অক্ষয় হয়ে থাকবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও বাংলাদেশের গুরুত্ব: আজ আমরা বুক ফুলিয়ে বলতে পারি, আমরাই প্রথম জাতি, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রক্ত দিয়েছি, অকাতরে জীবন দিয়েছি। মাতৃভাষার জন্য রক্ত এবং জীবন দেওয়ার ইতিহাস পৃথিবীতে আর নেই। সেই রক্ত বৃথা যায় নি। বিশ্ববাসী স্বীকৃতি দিয়েছে আমাদের
মাতৃভাষাকে। একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভের সাথে সাথে বাংলাদেশের গুরুত্বও বৃদ্ধি পেল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। সেই সাথে বাংলা ভাষা হলো গৌরবের ভাষা। একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে বাঙালির সংগ্রামের ও আত্মত্যাগের ঘটনা বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করল। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের মাধ্যমে বিশ্ববাসী অনুভব করতে সক্ষম হবে, মাতৃভাষা একটি দেশের জাতিসত্তার প্রধান বিবেচ্য বিষয়। তাই যখনই তাদের মাতৃভাষার ওপর কোন আঘাত আসবে, তখনই তারা আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠবে তাদের মাতৃভাষাকে রক্ষা করার জন্য। এর সাথে গুরুত্বের সাথে স্মরণীয় হয়ে থাকবে বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের নাম।

মাতৃভাষা দিবস প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ: মাতৃভাষা দিবসের সঠিক ইতিহাস বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশ সরকার কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ:

ক. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন: আমাদের মাতৃভাষাকে নিয়ে গবেষণা এবং পৃথিবীর সকল মাতৃভাষাকে রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশ সরকার একটি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা গবেষণা কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করেছেন। গোটা বিশ্বের তিন চার হাজার মাতৃভাষার কোনোটিই যেন হারিয়ে না যায়, এ কেন্দ্রে সেই বিষয়ে গবেষণা হচ্ছে। বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা, রয়েছে। ফলে এ কেন্দ্র একদিন বিশ্বের সকল মাতৃভাষা সংরক্ষণে সহায়ক হবে। এ জন্য বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে ভাষাতত্ত্ববিদ, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিতবর্গ ও নৃতত্ত্ববিদদের এখানে কাজ করার আমন্ত্রণ জানানো হয়। এর ফলে বাংলা ভাষার বিস্তৃতি ঘটছে বিশ্বের অনেক দেশে।

খ. বিশ্বভাষা মেলা আয়োজন: সে সময়ে ঠিক করা হয়েছিল, আগামী মহান একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে ঢাকায় আয়োজন করা হবে 'বিশ্বভাষা মেলা'। বর্ণাঢ্য এ মেলার সম্ভাব্য স্থান হচ্ছে রমনা পার্ক বা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। মেলার প্রধান আকর্ষণ হবে বিভিন্ন দেশের বর্ণমালা, গ্রন্থাদি ও মহান সাহিত্যিকদের আলোকচিত্র প্রদর্শনী। এছাড়া থাকবে ভাষা বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান, প্রামাণ্য চিত্র, আবৃত্তি, সংগীত পরিবেশন ইত্যাদি। মেলায় বাংলাদেশের একটি বড় স্টলসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্টল থাকবে।

গ. সিডি ও ভিডিও ক্যাসেট তৈরির পরিকল্পনা: বাংলা ভাষার উৎপত্তি, বিবর্তন ও পরিচয় বর্ণনা করে তৈরি একটি সিডি ও ভিডিও ক্যাসেট অচিরেই বিশ্বের ১৮৮টি দেশে পাঠানো হবে। এছাড়াও জাতিসংঘের ৫টি ভাষা; যথা: ইংরেজি, ফারসি, জার্মানি, স্প্যানিস ও আরবিতে সিডি ও ভিডিও ক্যাসেট তৈরি করা হবে।

উপসংহার: আমরা একুশ শতকে পদার্পণ করেছি। আমাদের জাতীয় জীবনে গত শতক ছিল আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম, যুদ্ধে ভরা টালমাটাল দিন। ইতিহাস থেকে আমরা অনেক কিছুই শিখেছি লাখ লাখ জীবনের বিনিময়ে। এদেশের মানুষ মাটির গন্ধ বড় বেশি ভালোবাসে। তাই তারা ভালোবাসে মাটির মাকে, আর মায়ের মুখের ভাষাকে। বাংলা মায়ের সন্তানেরা বিশ্বের বুকে নতুন শতকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য আজ দৃঢ়প্রত্যয়ী। আর সে জন্য আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মাতৃভাষার প্রচলন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

১৮. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

[রা. বো. '১৫; কু. বো, '১৯; দি. বো, '২০] [হলি ক্রস উচ্চ বালিকা . বিদ্যালয়, ঢাকা; আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা সেনানিবাস; বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল; বগুড়া জিলা স্কুল, বগুড়া; হরিমোহন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; ইবনে তাইমিয়া স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা, নোয়াখালি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নোয়াখালী; চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম; চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল; ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ভোলা; বরগুনা জিলা স্কুল, বরগুনা; রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর; দি মিলেনিয়াম স্টারস স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর, দিনাজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, দিনাজপুর]

ভূমিকা: বাঙালির জাতীয় জীবনে মহিমান্বিত এক অহংকার, গৌরবোজ্জ্বল এক বিজয়গাথার নাম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীনতার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সাথে যার নাম স্বমহিমায় জড়িয়ে আছে তিনি হলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালির অবিসংবাদীত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার ডাকেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নির্মিত হয়েছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের মানুষের আত্মত্যাগের অম্লান প্রতীক, দেশপ্রেমের এক জীবন্ত স্মারক। নয় মাসব্যাপী বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি: মধ্যযুগের প্রথম থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত প্রায় হাজার বছর ধরে ধনধান্য পুষ্পভরা সমৃদ্ধ বঙ্গের প্রতি তুর্কি, আফগান, পাঠান, মোগলরা আকর্ষিত হয়েছে ও দীর্ঘকাল শাসন করেছে। এরপর আসে লোভী ইংরেজরা শাসনের নামে শোষণ ও লুণ্ঠনের জন্য। প্রায় দুশো বছর ঔপনিবেশিক শাসনের পর তদানীন্তন পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তানের অধীন করে ইংরেজরা বিদায় নেয়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবর্গ শোষণ-বঞ্চনা ও নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্রায় ২৪ বছর টিকে থাকে। এর মধ্যেই বাঙালি জাতি অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটিয়েছে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন তথা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে নিজ মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে,

যা ছিল স্বাধীনতার বীজমন্ত্র। এরপর ১৯৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ১৯৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬-এর ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়লাভ মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি নির্মাণ ও মজবুত করেছে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নির্লজ্জ বৈষম্য, সম্পদ পাচার, উন্নয়নে একমুখী নীতি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ওপর জুলুম- নির্যাতন এদেশের মানুষকে স্বাধীনতার কথা ভাবতে উজ্জীবিত করে। এর ওপর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা ও আলোচনার নামে ষড়যন্ত্রকে এ দেশের মানুষ মেনে নিতে পারেনি। পাকিস্তানি চক্রান্ত বুঝতে পেরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। উন্মাতাল মানুষ সেই ডাকে বিপুলভাবে সাড়া দেয়। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লক্ষ লক্ষ মানুষের ঐতিহাসিক সমাবেশে এক উদ্দীপ্ত দিকনির্দেশনামূলক ভাষণে বঙ্গবন্ধু ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা দেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" সমগ্র জাতির কণ্ঠে দৃপ্ত স্লোগান ধ্বনিত হতে থাকে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'।

মুক্তিযুদ্ধের ডাক : চক্রান্তকারী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী একদিকে আলোচনার নামে প্রহসন, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও অস্ত্র এদেশে পাঠাতে থাকে। অসহযোগ আন্দোলন তুঙ্গে উঠলে তদানীন্তন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী '২৫ মার্চ মধ্য রাতে পূর্ববাংলার ঘুমন্ত নিরীহ মানুষের ওপর আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে। তারা নির্মমভাবে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে বাঙালির অবিসংবাদী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গ্রেফতারের পূর্ব মুহূর্তে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে ওয়্যারলেস বার্তায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এ দেশের আপামর মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ই.পি.আর, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ছুটি ভোগরত সৈনিক, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, সশস্ত্র পুলিশ, আনসার, ছাত্র-যুবকসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ প্রতিরোধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ: ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল কুষ্টিয়ার মুজিবনগর (বৈদ্যনাথতলা) আমবাগানে জন্ম নেয় একটি নতুন রাষ্ট্র, বাংলাদেশ। গঠিত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। নতুন সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম (রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে) মন্ত্রিসভার নাম ঘোষণা করেন। তাঁরা হলেন- রাষ্ট্রপতি: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান; উপ-রাষ্ট্রপতি: সৈয়দ নজরুল ইসলাম; প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ; পররাষ্ট্র, সংসদ ও

আইনমন্ত্রী: খন্দকার মুশতাক আহম্মদ; অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী: এম. মনসুর আলী; স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী: এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান। কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানীকে সেনাপ্রধান করে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশকে এগারোটি সেক্টরে ভাগ করা হয়। সেক্টর কমান্ডাররা হলেন: সেক্টর-১ মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর রফিকুল ইসলাম, সেক্টর-২ মেজর খালেদ মোশাররফ, ক্যাপ্টেন এ.টি.এম. হায়দার, সেক্টর-৩ মেজর কে. এম. শফিউল্লাহ, মেজর নুরুজ্জামান, সেক্টর-৪ মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত, সেক্টর-৫ মেজর মীর শওকত আলী, সেক্টর-৬ উইং কমান্ডার এম.কে. বাশার, সেক্টর-৭ মেজর নাজমুল হক, মেজর কিউ. এম. জামান, সেক্টর-৮ মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, মেজর এম.এ. মঞ্জুর, সেক্টর-৯ মেজর এম.এ. জলিল, সেক্টর-১০ কোনো নির্দিষ্ট কমান্ডার ছিলেন না, সেক্টর-১১ মেজর আবু তাহের, স্কোয়াড্রন লিডার এম. হামিদুল্লাহ খান।

এছাড়া কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে প্রায় ১৭ হাজার মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে গড়ে উঠেছিল 'কাদেরিয়া বাহিনী'।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও শরণার্থী শিবির: পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসরদের অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের কারণে এক কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নেয়। তাদের ঠাঁই হয় শরণার্থী শিবিরে। সেখান থেকে আগ্রহী ও উপযুক্ত লোকদের বাছাই করে তাদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেক্টর কমান্ডারদের অধীনে তারা গেরিলা ও সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত ও হীনবল করে ফেলে। গ্রাম ও শহরের মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, খাদ্য, চিকিৎসাসেবাসহ নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে মুক্তিযুদ্ধকে বিজয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন: ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়ার জনগণ ও সরকার মাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সরাসরি সমর্থন করে। এছাড়া যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি প্রভৃতি দেশের অসংখ্য বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, শিল্পী-সাহিত্যিক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করে নানাভাবে অকুণ্ঠ সাহায্য-সহযোগিতা করেন। ফলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নাজুক অবস্থায় পড়ে মনোবল হারিয়ে ফেলে।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও মুক্তিযুদ্ধের বিজয় : মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে ভীত-সন্ত্রস্ত হানাদার বাহিনী গ্রামাঞ্চল ছেড়ে শহরে পালাতে থাকে। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে বিমান হামলা চালায়। এ সময় মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনী চারদিক থেকে যৌথ অভিযান শুরু করে এগুতে থাকে ঢাকার দিকে। যৌথবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ ও বোমাবর্ষণের মুখে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা ১ মিনিটে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হানাদার বাহিনী বিনা শর্তে যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। জেনারেল নিয়াজী তাঁর নিজ পোশাক থেকে সামরিক ব্যাজগুলো খুলে অবনত মস্তকে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ জাতীয় পতাকা উন্নত শিরে তার বিজয় গৌরব ঘোষণা করে।

মুক্তিযুদ্ধের খেতাব: মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ মানুষের জীবনদান, আড়াই লাখ নারীর সম্ভ্রম ও কোটি কোটি টাকার সম্পদের বিনিময়ে স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ। যারা নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য অকুতোভয় সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করতে করতে জীবনদান করেছেন, তাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের প্রতি সম্মানস্বরূপ দেওয়া হয়েছে 'বীরশ্রেষ্ঠ', 'বীরউত্তম', 'বীরবিক্রম' ও 'বীরপ্রতীক' খেতাব। বীর শহিদদের মধ্যে সাতজন পেয়েছেন 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাব, এঁরা হলেন- সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, ন্যান্সনায়েক মুন্সী আবদুল রউফ, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান, ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ, সিপাহি হামিদুর রহমান, স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার রুহুল আমিন ও ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর। আমাদের সামনে এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে তাঁদের মৃত্যুঞ্জয় স্মৃতি।

উপসংহার : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আনন্দ-বেদনার এক স্বর্ণালি
অধ্যায়। অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নির্মাণই ছিল বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, যা ছিল মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ। এই আদর্শকে সমুন্নত রেখে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাথা ও সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে। যাতে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী, দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্টকারী, গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সুখী, শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলাই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

১৯. মাদকাসক্তি ও তার প্রতিকার

[সকল বোর্ড ২০১৮; ঢা. বো, '২০, '১২; য. বো. '১১; কু. বো, '১৬, '১৫, '১৩; সি. বো, '২০, '০২; চ. বো. '১০; ব. বো. '২০, '২০, '১৪]

ভূমিকা : বর্তমান সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষবাষ্পের মতো ছড়িয়ে পড়েছে নেশার উপকরণ। নেশা সর্বনাশা জেনেও মানুষ এর প্রতি আসক্ত হয়। এর নীল দংশনে দংশিত হচ্ছে কোটি কোটি মানুষ। ড্রাগ বা মাদকাসক্তি অতি আধুনিক সভ্যতার ক্ষেত্রে এক নতুন অভিশাপ। নিজের প্রকৃতিকে বাইরের মাদকের দ্বারা অপ্রকৃতিস্থ করার প্রবণতা চিরকালই মানুষের মধ্যে ছিল। কিন্তু যেহেতু মানুষ প্রকৃতির দাস নয়, এই আসক্তির বিপরীত সংস্কারও মানুষের মধ্যে আছে। তাই মানুষ অতীতে মাদকদ্রব্যে আসক্ত হয়েও বহুক্ষেত্রে আবার তাকে পরিত্যাগ করে স্বাভাবিক হতে পেরেছে। আজো আমাদের এদিক থেকে সচেতন হতে হবে, ড্রাগের কবল থেকে রক্ষা করতে হবে এদেশের তরুণ সমাজকে।

মাদকদ্রব্যসমূহ: মাদকের নেশা খুব দ্রুত মানুষকে আসক্ত করে, আর এই আসক্তির আকর্ষণশক্তি এত তীব্র যে, একবার যাকে স্পর্শ করে তার পক্ষে আবার পূর্বের সহজ জীবনে ফিরে আসা দুষ্কর। নারকোটিক ড্রাগ একজাতীয় মাদকদ্রব্য। হেরোইন, ব্রাউনসুগার, এল- এস-ডি, ম্যাক ইত্যাদি নানা রকম এর নাম। মানুষের নেশার জন্য রয়েছে আরও অনেক ড্রাগ। যেমন: গাঁজা, আফিম, চরস, ভাং, প্যাথেড্রিন, মরফিন, হাসিস, কোকেন ইত্যাদি ছাড়াও রয়েছে নানা রকম ঘুমের ট্যাবলেট। অধুনা আকাড়া কোকেনের সঙ্গে তামাক মিশিয়ে তৈরি করা হচ্ছে নতুন ধরনের মাদকদ্রব্য। এ নতুন ড্রাগ 'বাজুকো' নামে ইউরোপের বাজারগুলোতে এখন বেশ জমজমাট। গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল, গোল্ডেন ক্রিসেন্ট, গোল্ডেন ওয়েজ হেরোইনের মূল উৎস আফিম। আর আফিম পাওয়া যায় পপি উৎপাদনের মাধ্যমে। **সর্বনাশা নেশার উৎসভূমি:** মাদকের উৎস বিদেশের নানান দেশে। আমেরিকা মহাদেশের কলম্বিয়া, বলিভিয়া, লাতিন আমেরিকায় নারকোটিক ড্রাগ তৈরির বিশাল বিশাল চক্র আছে। আমাজানের অববাহিকার গভীর জঙ্গলে 'ল্যান্ড অব ট্যাঙ্ককোয়েলিটি' নামক অঞ্চলে নারকোটিক ড্রাগ শিল্পের বেআইনি শহরটির কথা প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়।

এশিয়ার তিনটি এলাকায় প্রধানত পপি উৎপাদিত হয়। এলাকা তিনটি হলো- গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল, গোল্ডেন ক্রিসেন্ট ও গোল্ডেন ওয়েজ। কর্কটক্রান্তির উত্তর ১৮০ থেকে ২৪০ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল অবস্থিত। এর পরিধি থাইল্যান্ড, লাওস ও বার্মা। পপি উৎপাদনকারী গোল্ডেন ক্রিসেন্টের বিস্তৃতি পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, তুরস্ক জুড়ে। এর মধ্যে সিংহভাগ উৎপন্ন হয় পাকিস্তানে। গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল ও গোল্ডেন ক্রিসেন্টের মধ্যবর্তী অপর একটি নতুন অঞ্চল গোল্ডেন ওয়েজ। এ অঞ্চলটি ভারত এবং নেপাল সীমান্তে। প্রাপ্ত তথ্য মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কলাম্বিয়া, বলিভিয়া, গুয়েতেমালা, জ্যামাইকা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, ঘানা, নাইজেরিয়া, কেনিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, পেরু কোকেন উৎপাদনকারী উল্লেখযোগ্য দেশ। মেক্সিকো, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরীর সীমান্ত প্রদেশ সাইপ্রাস, ইরান, আফগানিস্তান, ভারত, বার্মা, থাইল্যান্ড, নাওস ও অস্ট্রেলিয়ায় আফিম এবং হেরোইন উৎপন্ন হয়। হাসিস উৎপাদনের ক্ষেত্রে জ্যামাইকা, মরক্কো, জর্ডান, ভারত, নেপাল ও পাকিস্তান সমধিক পরিচিত।

পৃথিবী ও বাংলাদেশে মাদকাসক্ত লোকসংখ্যা: পৃথিবীর শতাধিক দেশের ৫০ থেকে ৬০ কোটি মানুষ মাদকে আসক্ত বলে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এক রিপোর্টে প্রকাশ করা হয়েছে। ৩৬টি দেশে অধিক ক্ষতিকর মাদক উৎপাদন করা হলেও এর স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শতাধিক দেশকে মাদকের লীলা ক্ষেত্রে পরিণত করেছে।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক এক সরকারি জরিপে জানা গেছে যে, সমগ্র দেশে ১৭ লাখ মানুষ মাদকাসক্ত। কিন্তু চিকিৎসকদের মতে, বর্তমানে দেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা ৫০ লাখেরও বেশি। প্যাথেড্রিন আসক্তদের মধ্যে বেশি হচ্ছে মহিলার সংখ্যা।

বিভিন্ন ধরনের ড্রাগের কবলে বাংলাদেশ: ড্রাগের উৎপাদন বাড়ছে দ্রুত গতিতে। এবার তো বাজার দরকার। এই বাজারের অন্যতম হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে। স্বাধীনতার কয়েক বছর পর থেকে বাংলাদেশে এই নেশা ব্যাপকভাবে ছড়াতে শুরু করেছিল। গাঁজা, চরস, হাসিস, হেরোইন, কোকেন, হেম্প, ব্রাউনসুগার, ওপিয়াম ডেরিভেটিস ইত্যাদি মাদকদ্রব্যে ছেয়ে গেছে দেশ। $\frac{1}{16}$ গ্রাম হেরোইন বা ব্রাউনসুগার দু থেকে তিনবার ১৬ ব্যবহার করলে সে ব্যক্তি আর এ নেশা থেকে নিজেকে সহজে মুক্ত করতে পারে না। কৌতূহলের বশবর্তী হয়েও যারা এ নেশার কবলে একবার প্রবেশ করেছে, তারা হয়েছে নরকের কারাগারে বন্দী।

মাদকাসক্তির কারণ: বেকারত্ব, হতাশা, বন্ধুবান্ধবের প্ররোচনায় কৌতূহল মেটাতেও মানুষ দুএকবার মাদক সেবন করতে গিয়ে আর বেরিয়ে আসতে পারে নি তার যাদুস্পর্শ থেকে। কোথাও কোনো মানসিক আঘাত পেলে সাময়িকভাবে ভুলে থাকার জন্যও মানুষ মাদক সেবন করে, কিন্তু পরে তা নেশায় পরিণত হয়। তাছাড়া চিরন্তন নতুনত্বের নেশা, নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দুর্নিবার আকর্ষণ এবং সাময়িক ভালোলাগার বশবর্তী হয়েও অনেকে আসক্ত হয়। দেশের বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় কেউ কেউ নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে না পেরে হতাশায় ভোগে এবং তা থেকে আসক্ত হতে শুরু করে। মাদকাসক্ত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক মাদক ব্যবসায়ীরাও দূর থেকে কাজ করে থাকে।

মাদকাসক্ত হবার প্রাথমিক লক্ষণ ও পরিণতি: মাদকাসক্ত হবার পরিণতি খুবই ভয়াবহ। ড্রাগে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের আচার আচরণের মধ্যে একটা খাপছাড়া ভাব পরিলক্ষিত হয়। চেহারাও হয়ে যায় রুক্ষ। খিদে না পাওয়া এবং দ্রুত ওজন হ্রাস এ আসক্তির প্রাথমিক লক্ষণ। দেখা যায়, তারা যখন তখন নিজের ঘরে ফিরে আসছে। সেই সঙ্গে বইপত্র, খাতা-কলম ও অন্যান্য দ্রব্য হারিয়ে ফেলা, পায়খানা বা বাথরুমে বেশি সময় কাটানো, চোখের তারা ছোট হয়ে যাওয়া, এমন কি চুরির অভ্যাসও দেখা যায়। এ সময় থেকেই অভিভাবকদের সাবধান হওয়া উচিত। চিকিৎসকদের মতে, এ ভালোলাগা থেকেই ধীরে ধীরে স্নায়ু অসাড় হয়ে যায়, কর্মক্ষমতা লোপ পায় এবং ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি বেজে ওঠে জীবনে।

প্রতিকার: আমাদের তরুণ সমাজই মাদকাসক্তির কবলে আক্রান্ত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। এ থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে না পারলে জাতির জন্য তা অভিশাপ হয়ে থাকবে। এর ক্ষতিকর দিক বিবেচনা করে বিশ্ব জুড়ে তা প্রতিরোধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, আমদানি, বিক্রয় ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করে বিশ্বের সকল দেশে আইন তৈরি করা হয়েছে। শুধু মাদকাসক্তির কুফলের কথা প্রচার করে বা উপদেশ দিয়ে এ ভয়ংকর ব্যাধির প্রতিকার করা যাবে না। এর হাত থেকে রক্ষার জন্য কঠোর আইন যেমন প্রয়োজন, তেমনি পারিবারিক ও সামাজিকভাবে প্রতিকার করতে হবে।

নেশামত্ত ব্যক্তিদের সমাজে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং চলমান সুস্থ জীবনের সঙ্গে তাদের মেলাতে হবে। এর জন্য মাদকাসক্ত রোগীদের উপযুক্ত চিকিৎসা প্রয়োজন। সে সাথে প্রয়োজন রক্ষণাবেক্ষণ।

প্রথম পর্যায়ে এসব রোগীদের সতর্কভাবে রাখতে হবে, দরকার হলে বেঁধে রাখতে হবে, যেন এরা নেশার দুর্নিবার আকর্ষণে ছিটকে বেরিয়ে আসতে না পারে। নেশা ছাড়ার সময় এরা নেশার বস্তুর জন্য উন্মাদপ্রায় হয়ে যায়। তারপর এদের দিতে হবে মরফিন ইনজেকশন যা ব্যথা কমায় ও সুখ আনে। উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে যেন শারীরিক ক্রিয়াগুলো যথাযথ সম্পন্ন হয়। আত্মবিশ্লেষণের জন্য নির্জন বাসও এদের কখনো কখনো দরকার। তখন সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট বা মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন। এরপর রোগীদের জন্য প্রয়োজন পুনর্বাসন।

উপসংহার: মাদকাসক্তির ভয়াবহ দাবানল আমাদের তরুণ সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের রোগ নিরাময়ের দায়িত্ব সকলকে গ্রহণ করতে হবে। প্রধান দায়িত্ব হলো প্রশাসনের। তারা দৃঢ় হাতে হাল না ধরলে সামাজিক অপকর্মসমূহ রোধ করা যাবে না। মাদক ব্যবসায়ে লিপ্ত দুষ্কৃতদের কঠিন শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু সাধারণ মানুষ যদি এ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে না আসে, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে না দেয়, তবে এই কদর্য ব্যাধির অপসারণ সম্ভব নয়। তাই দেশের সর্বস্তরের মানুষকে মাদকাসক্তির সর্বনাশা অভিশাপ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

২০. জাতিগঠনে নারীসমাজের ভূমিকা

[ঢা. বো. '১৪; রা. বো. '২০, '০৪; য. বো. '০৯; কু. বো. '১৪, '১১; সি. বো. '১৭; চ. বো. '১১; ব. বো. '১৯, '১২, '০৪; দি. বো. '১৫, '১২] [বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল; ইবনে তাইমিয়া স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা; কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কক্সবাজার]

ভূমিকা : আধুনিক জ্ঞানভিত্তিক, উন্নত ও প্রগতিশীল জাতি গঠনে নারীসমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সুদূর অতীতে পরিবার গঠনে এবং কৃষিসভ্যতার সূচনায় নারীরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা শুরুর পর থেকে নারীকে কোনঠাসা করা হলেও তাদের গঠনমূলক ও কল্যাণকর ভূমিকা খুব বেশি সীমিত হয়নি। বরং পুরুষের পাশাপাশি থেকে তারা সভ্যতার অগ্রগতিতে সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়েছে। বর্তমানে নারী কেবল স্ত্রী- কন্যা-মা নয়, ব্যক্তিত্ববোধে জাগ্রত স্বতন্ত্র সত্তা। তাই সমাজ উন্নয়নের স্রোতধারায় তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতিগঠনে যথাযথ ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি করা সময়েরই জোরালো দাবি।

জাতিগঠনে নারীসমাজের ভূমিকা: জাতিগঠনে নারীসমাজের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। বাঙালি পুরুষের পাশাপশি বাঙালি নারীসমাজও বাঙালি জাতিসত্তা বিনির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে আশ্রয় করেই বাঙালি জাতিসত্তা গড়ে উঠেছে। তা শুরু হয়েছে পরিবারের নারীদের উদ্যোগেই। তারা যেমন বাংলা ভাষাকে ধারণ করেছে, তেমনি স্বতন্ত্র সংস্কৃতিকেও ধারণ ও সঞ্চারিত করেছে যুগ যুগ ধরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবের মধ্য দিয়েই জাতি অগ্রসর হয়েছে স্বতন্ত্র ভাষা-সংস্কৃতি লালন ও ধারণ করে। বিজাতীয় ভাষার আক্রমণেও মূলত নারীসমাজই তা অক্ষুণ্ন রেখেছে বারবার। বাঙালি জাতিসত্তার বিস্ফোরণ ও উৎসারণ ঘটেছে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে। বিজাতীয় ভাষা জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রকে রুখে দিয়েছে বাঙালি, নারী সমাজকে সাথে নিয়ে। এখানেই বৃহত্তর গুরুত্বের সঙ্গে চোখে পড়েছে নারীসমাজও জাতিগঠনের সক্রিয় সাথি। এরপর ১৯৫৪, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯- এর আন্দোলনেও নারীর ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে ও মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির মহত্তম স্বার্থে নারীসমাজ জনমত গঠনে, সাংগঠনিক কার্যক্রমে, সেবাপরায়ণতায়, যুদ্ধে অংশ নিয়ে, নিজেদের সম্ভ্রম উৎসর্গ করে জাতিগঠনে নিজেদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতার পর দেশের পুনর্গঠনে অবিরাম কাজ করেছে নারীসমাজ।

রাস্তাঘাট নির্মাণে, ফসল উৎপাদনে, শিল্পশ্রমিক হিসেবে, শিক্ষা কার্যক্রমে, কুটিরশিল্পে নিয়োজিত হয়ে জাতিগঠনে অবদান রেখেছে। আজকের দিনে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে, ব্যবসায়- বাণিজ্যে, শিল্পকারখানায় নারীর শ্রম ও ত্যাগ আর্থসামাজিক বুনিয়াদ শক্তিশালী করেছে। পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে জাতিগঠনে নারীসমাজের ভূমিকা আজ গর্বের সাথে স্মরণযোগ্য।

উন্নত দেশে জাতিগঠনে নারী: ইউরোপ-আমেরিকা তথা উন্নত দেশগুলোতে নারীকে উন্নত মর্যাদা দেওয়া হয়। তারা দেশ ও জাতি গঠনে পুরুষের সাথে সমান তালে এগিয়ে চলে। দেশের প্রশাসনের প্রতিটি সেক্টরে যেমন তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ আছে, তেমনি শিল্প- কারখানা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, গবেষণা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মহাকাশ অভিযানসহ সবক্ষেত্রেই নারীদের অবাধ অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে তারা নিজেরাই বেছে নিয়েছে তাদের কর্মক্ষেত্র এবং কর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে তারা প্রমাণ করেছে তাদের মেধা ও যোগ্যতা।

জাতিগঠনে নারীর অন্তরায়সমূহ: বাংলাদেশে পুরুষ ও নারীর অনুপাত প্রায় সমান। মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও তারা নানা বৈষম্যের শিকার। এদেশের নারীরা এখনও সমাজের নানা নিয়ম- কানুন, আচার-আচরণের বেড়াজালে বন্দি। আজও তারা শ্রম বৈষম্যের শিকার। পুরুষের সমান শ্রম দেওয়া সত্ত্বেও তাদের পারিশ্রমিক কম। সন্তানহীনতা ও কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য তাদেরকেই দায়ী করা হয়। আজও তারা যৌতুকের জন্য অমানবিক নির্যাতন ভোগ করে। শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও নারীকে পণ্যের মতো ভোগ্যসামগ্রী মনে করা হয়। নারীকে অবমাননা ও অবহেলা করায় দেশ ও জাতিগঠনকে ত্বরান্বিত করতে ও সুষম সমাজব্যবস্থা নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে না। আজও একশ্রেণির সংকীর্ণচিত্তের মানুষ নারীকে অবরুদ্ধ করে জাতিকে পশ্চাতে ঠেলে দেওয়ার অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। এটা সুষম ও প্রগতিশীল সমাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়।

জাতিগঠনে শিক্ষিত নারীর ভূমিকা: নারীসমাজকে পেছনে রেখে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন কখনো সম্ভব নয়। এজন্য নেপোলিয়ন বলেছিলেন, 'আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।' তাই সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতির জন্য শিক্ষিত নারীর একান্ত প্রয়োজন। কেননা একটি শিশুর জন্ম, প্রাথমিক শিক্ষা ও বিকাশ সবই শুরু হয় মায়ের সাহচর্যে। একজন সুশিক্ষিত মা তার সন্তানের সুশিক্ষা, নৈতিকতা, চরিত্র গঠনের প্রাথমিক ভিত্তি নির্মাণ নিশ্চিত করতে পারেন। তিনি পরিবারের সবার স্বাস্থ্যরক্ষা, সংসারের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ, যথাযথ সেবা-যত্ন, জরুরি কাজকর্ম সম্পাদন করে একটা আদর্শ ও উন্নত পরিবার গঠনে পর্যাপ্ত সহায়তা করতে পারেন। শিক্ষিত নারীরা এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী, হাইকোর্টের বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জাতীয় সংসদের স্পিকার হয়ে জাতিগঠনে সর্বোচ্চ অবদান রাখছেন। এভাবেই আদর্শ সমাজ ও আদর্শ দেশ গঠনের প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই সম্পন্ন হয়।

জাতিগঠনে নারীসমাজের মুক্তি আন্দোলন: এদেশের অধিকারবঞ্চিত অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের আধিকারসচেতন করে জাগিয়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন মহীয়সী নারী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনিই প্রথম নারী-শিক্ষালয় গড়ে তুলে এবং লেখনীর মাধ্যমে নারী-জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরই পথ ধরে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ধাপে ধাপে কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন শামসুর নাহার মাহমুদ, বেগম সুফিয়া কামাল, শহিদ জননী জাহানারা ইমাম, ড. মালেকা বেগম প্রমুখ নারী নেতৃবৃন্দ। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও নারী আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন।

জাতিগঠনে নারীসমাজের বর্তমান অবস্থান: বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর এদেশের নারীসমাজ ভাষা-শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে শুরু করে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে নারীর অবস্থান সুদৃঢ় হতে শুরু করেছে। পুরুষের কর্মক্ষেত্রের সর্বত্র নারীরা সমানভাবে অংশগ্রহণ করছে। শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে নয়, প্রশাসনের প্রতিটি বিভাগে, পদাতিক-নৌ- বিমানবাহিনী, পুলিশ ও আনসার বাহিনী, চিকিৎসা ও প্রকৌশল, বিচারবিভাগ, জাতীয় সংসদ এমনকি মন্ত্রিসভায়ও নারীর উপস্থিতি যথার্থই উৎসাহব্যঞ্জক। নারীসমাজ সবচেয়ে বেশি সক্রিয় অবদান রাখছে অর্থনৈতিক উন্নয়নে। এদেশের শিল্প-কারখানা বিশেষ করে পোশাক শিল্পে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশাল ভূমিকা রাখছে। ব্যাংক-বিমাসহ ব্যবসায়-বাণিজ্যের সব ক্ষেত্রেই নারীর অবস্থান এখন প্রশংসাযোগ্য। বিদেশে চাকরি গ্রহণ করে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠানোর ক্ষেত্রেও নারীসমাজ পিছিয়ে নেই। মোট কথা, শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত নারীসমাজ এখন আর ঘরে বসে থাকছে না। পুরুষের পাশাপাশি তাঁরাও পরিবারের সার্বিক উন্নতি ও অগ্রগতিতে দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করছে। আর এর ফলে দেশ ও জাতি গঠনে এসেছে বৈপ্লবিক জাগরণ।

জাতিগঠনে নারীর ভূমিকায় সরকারের প্রস্তুতি: দেশ ও জাতি গঠনে নারীসমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকারের ভূমিকা খুবই গঠনমূলক ও উৎসাহব্যঞ্জক। নারীশিক্ষা বিস্তার ও নারীর ক্ষমতায়নকেই এক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ, স্কুল পর্যায়ে মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান, নবম শ্রেণি পর্যন্ত বছরের প্রথমেই বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুস্তক বিতরণ, প্রতিটি জেলা-উপজেলায় মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল ও কলেজ স্থাপন, বয়স্ক নারীদের শিক্ষাদানের জন্য বয়স্ক নারী শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, বয়স্ক নারীদের ভাতা প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কিছু কিছু চাকরির ক্ষেত্রে কোটা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক আসন সংরক্ষিত রয়েছে। সরকার এসবের মাধ্যমে নারীসমাজকে জাতিগঠনে ভূমিকা রাখার জন্য প্রস্তুতি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছেন।

জাতিগঠনে নারীর অধিক ভূমিকার জন্য করণীয়সমূহ: নারী সমস্যার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর সমাধানের স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিতে হবে, যাতে দেশ ও জাতি গঠনে নারীর অংশগ্রহণ আরও বিস্তৃত হয়। যেমন-

১. রাজনীতিতে নারীদের ব্যাপকহারে অংশগ্রহণ করতে হবে।

২. নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বিস্তৃত করতে হবে।

৩. সংসদে ও মন্ত্রিপরিষদে উল্লেখযোগ্য অনুপাতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৪. প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে অধিকহারে ক্যাবিনেট পদসহ মন্ত্রণালয়ে ও অধিদপ্তরসমূহে নারী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে।

৫. পাবলিক সেক্টর ও কর্পোরেশনগুলোতে ২৫ শতাংশ নারী নিয়োগের বিধি প্রচলন করতে হবে।

৬. স্থানীয় সরকারের তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের শিক্ষা ও বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনায় যোগ্য করে তুলতে হবে।

৭. বিনা খরচে নারীদের স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. গণশিক্ষা, নারীশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের প্রসার ঘটিয়ে নারীশিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটাতে হবে।

উপসংহার : জাতীয় জীবনে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করতে হলে দেশ ও জাতি গঠনে অধিকহারে নারীসমাজের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। এ জন্য নারীর প্রাপ্য মৌলিক অধিকার, তার মর্যাদা এবং তার ক্ষমতায়ন সর্বক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে। পুরুষের সমপর্যায়ে নারী প্রতিষ্ঠিত হলে মানব-সভ্যতাও বিস্ময়করভাবে পরিপুষ্ট হবে। আর এ পর্যায়ে বাত্ময় হয়ে উঠবে কবির মহান বাণী-

'কোনো কালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারি
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয়লক্ষ্মী নারী।' - কাজী নজরুল ইসলাম

২১. পদ্মা বহুমুখী সেতু

ভূমিকা: বাংলাদেশের সবচেয়ে খরস্রোতা ও প্রশস্ত পদ্মা নদীর ওপর নির্মিত পদ্মা সেতু বাংলাদেশের জন্য অভাবনীয় এক কীর্তি- নতুন এক 'নেশন ব্র্যান্ডিং'। এই সেতু বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সংযোগ ঘটিয়েছে। বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতু খুলে দেবে নতুন সম্ভাবনার অবারিত দুয়ার, উন্নত ও সুখময় হবে মানুষের জীবনযাত্রা। এ দেশের মানুষের উদ্যম ও সক্ষমতার প্রতীক পদ্মা সেতু। গৌরব, অহংকার ও

দুয়ার, উন্নত ও সুখময় হবে মানুষের জীবনযাত্রা। এ দেশের মানুষের উদ্যম ও সক্ষমতার প্রতীক পদ্মা সেতু। গৌরব, অহংকার ও আত্মমর্যাদার সমুজ্জ্বল প্রতীক পদ্মা সেতু।

পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশের বুক চিরে বয়ে চলেছে অসংখ্য নদ-নদী। এ কারণে আমাদের যাতায়াত ব্যবস্থায় প্রতিনিয়তই নৌপথের সাহায্য নিতে হয়। এতে তৈরি হয় দীর্ঘসূত্রতা ও মন্থরতা। একে গতিশীল করার জন্য প্রয়োজন হয় সেতুর। পদ্মা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নদী। এ নদী পারাপারে মানুষের দুঃখ, কষ্ট ও দুর্ভোগের সীমা ছিল না। তাই দীর্ঘদিন ধরে এ দেশের দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ পদ্মা নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের জন্য বিভিন্ন সময়ে দাবি করে আসছিল। অবশেষে এ সেতুর সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় এনে ১৯৯৮ সালের সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সমীক্ষা যাচাইয়ের পর ২০০১ সালে এ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। কিন্তু অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ায় তা কিছুকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়। ২০০৯ সালে পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের তৎপরতা আবার শুরু হয়।

অর্থায়ন নিয়ে জটিলতা: AECOM-এর নকশায় পদ্মা নদীর ওপর পদ্মা বহুমুখী সেতু'র নির্মাণকাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল ২০১১ সালে এবং শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০১৩ সালে। পুরো প্রকল্পের প্রস্তাবিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ২৯২ কোটি ডলার। এটি নির্মাণে বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাইকা, আইডিবি ও আবুধাবি ডেভেলপমেন্ট গ্রুপের ঋণ সহায়তা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরামর্শক নিয়োগে তথাকথিত দুর্নীতির অভিযোগে ২৯ জুন, ২০১২ সালে বিশ্বব্যাংক ১২০ কোটি ডলার ঋণ সহায়তা বাতিল করে। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাও পিছিয়ে যায়। ফলে পদ্মা সেতুর ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কিছু সময়ের জন্য এ দেশের মানুষ দুঃখ, ক্ষোভ ও হতাশায় নিমজ্জিত হয়।

প্রধানমন্ত্রীর সাহসী সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশের মানুষ স্বপ্ন দেখা ও বাস্তবায়নের রূপকার। তারা সাহসী ও সংগ্রামী। প্রতিনিয়ত লড়াই বেঁচে থাকার প্রত্যয় দীপ্ত এদেশের মানুষ পরক্ষণেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাংকের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সরকারও। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা এ দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের ঘোষণা দিলেন তেজোদীপ্ত কণ্ঠে। তার এ সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী এবং অনন্য ও সাহসী।

পদ্মা সেতুর রূপরেখা: পদ্মা সেতু বাংলাদেশের দীর্ঘতম সেতু। এ সেতুর নকশা প্রণয়ন করেছে AECOM। এটি মুন্সীগঞ্জ জেলার মাওয়া প্রান্তের সঙ্গে শরিয়তপুর জেলার জাজিরা প্রান্তের সংযোগ ঘটিয়েছে। দ্বিতল এ সেতু সম্পূর্ণভাবে কংক্রিট ও স্টিল দিয়ে তৈরি হয়েছে। এর ওপর দিয়ে চলছে যানবাহন এবং নিচ দিয়ে চলবে ট্রেন। চার লেনবিশিষ্ট মূল সেতুর দৈর্ঘ্য ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার এবং প্রশ্ন ২২ মিটার। দুই প্রান্তে সেতুর ভায়াডাক্ট ৩ দশমিক ১৮ কিলোমিটার এবং সংযোগ সড়ক ১২ কিলোমিটার। নদীর দুই পাড়ে নদীশাসনের কাজ হয়েছে ১৪ কিলোমিটার। মূল সেতুর মোট পিলার ৪২টি, মোট স্প্যান ৪১টি এবং মোট পাইলিং সংখ্যা ২৬৪। এর উচ্চতা ১৮ মিটার। পদ্মা সেতু নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড। পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ জুলাই, ২০০১ সালে। এ সেতুর মূল কাজ শুরু হয়েছে ২৬ নভেম্বর, ২০১৪ সালে এবং শেষ হয়েছে ২৩ জুন, ২০২২। পদ্মা সেতুর শুভ উদ্বোধন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ জুন, ২০২২ এবং সেতুর ওপর দিয়ে যানবাহন চলাচল শুরু হয়েছে ২৬ জুন, ২০২২ থেকে।

অভূতপূর্ব কর্মযজ্ঞ : পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পকে ঘিরে গড়ে ওঠে অভূতপূর্ব কর্মযজ্ঞ। মূল সেতুর নির্মাণকাজের পাশাপাশি মাওয়া ও জাজিরা প্রান্তে সংযোগ সড়ক নির্মাণ, ভূমিগ্রহণ ও পুনর্বাসন, নদীশাসনের কাজ, পরিবেশ রক্ষা কার্যক্রমে বৃক্ষরোপণ ও বাগান তৈরি, নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা, সেনাবাহিনীর তদারকি ইত্যাদি। বিশাল এ কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করেছেন বহুসংখ্যক প্রকৌশলী, পরামর্শক, বিভিন্ন খাতে বিশেষজ্ঞ এবং হাজার হাজার শ্রমিক। প্রথম দিকে ২০০ বিদেশিসহ প্রায় দুই হাজার লোক এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। পুরোদমে কাজ শুরু হলে দুই হাজার বিদেশি প্রকৌশলী ও কর্মী এবং প্রায় ২০ হাজার বাংলাদেশি কর্মী এতে যুক্ত হন।

মূল সেতু ও নদীশাসন কাজের পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছে কোরিয়ান এক্সপ্রেসওয়ে। সেনাবাহিনীর স্পেশাল ওয়ার্কস অর্গানাইজেশন সংযোগ সড়ক ও সার্ভিস এরিয়ার পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছে। সার্ভিস এরিয়া, সংযোগ সড়ক ও টোল প্লাজার কাজ করেছে আবদুল মোনেম লিমিটেড। চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড ২৬ নভেম্বর, ২০১৪ সালে মূল সেতু নির্মাণের কার্যাদেশ পাওয়ার পর চীন থেকে আসতে শুরু করে ৪ হাজার টন ওজনের বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রেনসহ ভারী যন্ত্রপাতি। জার্মানি থেকে আসে ৩ হাজার টন ওজনের সবচেয়ে শক্তিশালী হ্যামার। প্রথমেই শুরু হয় মাওয়া থেকে জাজিরা প্রান্ত পর্যন্ত নদী পাইলিংয়ের মতো কঠিন ও জটিল কাজ। সেতুর দুই পাড়ে নদীশাসনের কাজ শুরু হয় আগেই। পাশাপাশি চলে সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজ। জাজিরা প্রান্তে পাইলিংয়ের কাজ শেষ হলে শুরু হয় স্প্যান বসানোর কাজ। একইভাবে মাওয়া প্রান্তে পাইলিং শেষে স্প্যান বসানো শুরু হয়। এরপর শুরু হয় পিচ ঢালাইয়ের কাজ। পাশাপাশি দ্বিতল সেতুর নিচের অংশে রেলওয়ে স্ল্যাব বসানোর কাজও শেষ হয়। সেতুর দুই প্রান্তের সড়ক, টোল প্লাজা এবং নির্মাণ অবকাঠামোর কাজ শেষ হলে সড়কের দুপাশে বৃক্ষরোপণসহ সড়কদ্বীপে তৈরি করা হয় ফুলের বাগান। সেতুতে বসে সবকটি ল্যাম্পপোস্ট, সড়ক বাতিতে দেওয়া হয় বিদ্যুৎ সংযোগ। রোড মার্কিংয়ের কাজ শেষে যানবাহন চলাচলের জন্য পদ্মা সেতু প্রস্তুত হয়ে ওঠে। কেবল নিচের অংশে রেললাইনের কংক্রিট ঢালাইয়ের পর হিসাব অনুযায়ী ২০২২ সালের ডিসেম্বর নাগাদ পদ্মা সেতু দিয়ে ট্রেন চলবে।

প্রকল্প ব্যয়: পদ্মা সেতু নির্মাণে প্রথমে ১০ হাজার ২৬২ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছিল। ২০১১ সালে সেতুর নির্মাণ ব্যয় ২০ হাজার ৫০৭ কোটি ২০ লাখ টাকায় উন্নীত করে একনেকে অনুমোদন পায়। ২০১৬ সালে আবারও ৮ হাজার ২৮৬ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

সর্বশেষ আরও ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা বেড়ে মোট ব্যয় দাঁড়ায় ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা।

পদ্মা সেতুর বর্ণাঢ্য উদ্বোধন: বিশ্ব ইতিহাসে মাইলফলক পদ্মা সেতু। বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত বহুল প্রতীক্ষিত পদ্মা সেতুর উদ্বোধনে প্রাণের উচ্ছ্বাসে পদ্মাপাড় জনসমুদ্রে পরিণত হয়। মুহুর্মুহু পুরো এলাকায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু'। বাতাসে ওড়ে রঙিন আবির, বিমান থেকে ছাড়া হয় রঙিন ধোঁয়া, হেলিকপ্টার থেকে ঝরে রং-বেরঙের জরি, শিল্পীদের কণ্ঠে 'থিম সং'- এ প্রাণের আবেগের ছোঁয়া। প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয়ে নৃত্যের ছন্দ, মুখমণ্ডলে গৌরবের আবেশ; প্রত্যেকের পোশাকে, সাজসজ্জায় তারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।

২৫ জুন, ২০২২ বেলা ১১টা ৫৮ মিনিটে সুইচ টিপে পদ্মা সেতুর ফলক উন্মোচন করে সেতুর উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি ফলকের স্থানে নির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ম্যুরাল উন্মোচন করেন। করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে চারদিক। জাজিরার দিকে যাওয়ার পথে তিনি সেতুর ওপর নেমে প্রায় ১৫ মিনিট উপভোগ করেন বিমান ও হেলিকপ্টারের ফ্লাইং ডিসপ্লে। এ সময় মিগ-২৯ জঙ্গি বিমানের প্রদর্শনীও উপভোগ করেন মাননীয় সরকারপ্রধান। ১২টা ৩৫ মিনিটে জাজিরা প্রান্তে পৌঁছে তিনি পদ্মা সেতুর ফলক উন্মোচন করেন। ১২টা ৫১ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী জনসভাস্থলে পৌঁছে লক্ষ লক্ষ মানুষের শুভেচ্ছার জবাব দেন এবং তাদের উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ ও ইতিবাচক ভাষণ দেন।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পদ্মা সেতুর গুরুত্ব: বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পদ্মা সেতুর গুরুত্ব, তাৎপর্য ও উপযোগিতা অপরিসীম। নিচে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদ্মা সেতুর আর্থ- সামাজিক গুরুত্ব তুলে ধরা হলো-

ক. যোগাযোগ ক্ষেত্রে: পদ্মা সেতু চালু হাওয়ার পর দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ খুব সহজে এবং অল্প সময়ে রাজধানী ঢাকায় এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে যাতায়াত করতে পারছে। তাদের উৎপাদিত নানা সমাগ্রী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনায়াসে সরবরাহ করতে পারছে। পায়রা ও মংলা সমুদ্রবন্দর এবং পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যোগাযোগের ক্ষেত্রে পদ্মা সেতু হবে সূতিকাগার। এছাড়া বেনাপোল, ভোমরা ও দর্শনা স্থলবন্দরের সঙ্গে বিভিন্ন জেলার মধ্য দিয়ে আন্তর্দেশীয় যোগাযোগের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

খ. পর্যটন ক্ষেত্রে: বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল হবে পর্যটনের উৎকৃষ্ট কেন্দ্র। ছুটি পেলেই মানুষ ছুটে যাবে মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক স্থান কুয়াকাটা, সুন্দরবন, ষাটগম্বুজ মসজিদ, টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি, পায়রা সমুদ্রবন্দর পরিদর্শনে।

গ. শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যক্ষেত্রে: পদ্মা সেতুর এপার-ওপারের বিভিন্ন জেলায় ইতোমধ্যে ছোট-বড় নানা শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার তৎপরতা লক্ষ করা যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারও পদ্মার চরাঞ্চলে অলিম্পিক ভিলেজ, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিটি, হাইটেক পার্ক, আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, বিমানবন্দর ইত্যাদি প্রকল্পের কথা ভাবছে। পদ্মা সেতুর কাছেই গড়ে উঠছে শেখ হাসিনা তাঁতপল্লি। খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালীতে জাহাজ নির্মাণ শিল্প দ্রুত বিকশিত হবে। ইতোমধ্যে নানা ধরনের এসএমই উদ্যোগ স্থাপনের হিড়িক পড়েছে। পোশাক শিল্প, অ্যাগ্রো প্রসেসিং শিল্প গড়ে তোলার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

ঘ. কৃষিক্ষেত্রে: বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসহ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকার কৃষক, মৎস্যজীবী, তাঁতি ও অন্যান্য কৃষি সংশ্লিষ্ট মানুষ মানসম্পন্ন কৃষিদ্রব্য চাষ, আহরণ ও উৎপাদনে উৎসাহী হবে।

ব্যবসায়ীরা বরিশাল, পটুয়াখালী, বাগেরহাট, গোপালগঞ্জ, খুলনা ও সাতক্ষীরা থেকে মাছ ও অন্যান্য কৃষিজ পণ্য দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করতে পারবে সহজেই। এছাড়া নড়াইল, যশোর, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, ফরিদপুরের আম, লিচু, কালোজিরা, ধনে, তিল, তিসি, সরিষা, পিয়াজ, মধু, দই ও ঘিয়ের মতো কৃষিজ সামগ্রীর ন্যায্য দাম পেয়ে উৎপাদনে আরও বেশি আগ্রহী হয়ে উঠবে।

ঙ. দারিদ্র্য বিমোচনে: কৃষি ও শিল্পসামগ্রীর ন্যায্যমূল্য পেয়ে পদ্মার ওপারের বিশাল এলাকার দরিদ্র মানুষ তাদের জীবনমান উন্নয়নে তৎপর হয়ে উঠেছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে তারা আর্থিকভাবে সচ্ছল হওয়ার সুযোগ তৈরি করছে। মাঝারি ও বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়ে এলাকার মানুষ তাদের দারিদ্রদ্র্য বিমোচন করতে পারবে। এভাবেই দারিদ্র্য নিরসনসহ আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে পদ্মা সেতু গুরুত্বপূর্ণ অবদান অব্যাহত রাখবে।

জিডিপি: সার্বিকভাবে পদ্মা সেতু আমাদের জাতীয় জিডিপিতে ১.২৬ শতাংশ প্রতিবছর যোগ করবে। আঞ্চলিক জিডিপিতে যোগ হবে ৩.৫ শতাংশ। পদ্মা সেতুতে রেল চালু হলে জাতীয় জিডিপিতে যোগ হবে আরও ১ শতাংশ। প্রতিবছর দক্ষিণ বাংলায় দারিদ্র্য কমবে ১.০৪ শতাংশের মতো। জাতীয় পর্যায়ে তা কমবে ০.৮৪ শতংশ।

উপসংহার: পদ্মা সেতু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা, প্রকৌশল উৎকর্ষ ও সামগ্রিক পারঙ্গমতার প্রতীক এবং জাতি হিসেবে আমাদের নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার সোপান। কীর্তিনাশা পদ্মার ওপর নির্মিত এ সেতু বাংলাদেশের এক অভাবনীয় কীর্তি। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার পথে এটি একটি মাইলফলক। ডিজাইন কমপ্লেক্সিটি, নির্মাণশৈলী ও ভৌত কাজের পরিমাণ বিবেচনায় এ সেতু ইতোমধ্যেই 'পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়সাশ্রয়ী স্থাপনা' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর এটাই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। সচল অর্থনীতির সফল চাবিকাঠি পদ্মা সেতু নির্মাণের মাধ্যমে নিজ গৌরবে আরও একবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ।

২২. মেট্রোরেল প্রকল্প

ভূমিকা: বর্তমান সরকারের গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং মেগা প্রকল্পগুলোর মধ্যে ঢাকা মেট্রোরেল অন্যতম। বিশ্বের জনবহুল মেগা সিটিগুলোর মধ্যে ঢাকা অত্যধিক ঘনবসতিপূর্ণ। এর বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। ঢাকার ভয়াবহ যানজট ও ট্রাফিক সমস্যা দূর করার জন্য মেট্রোরেল প্রকল্প একটি সময়োচিত ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঢাকার বিপুল সংখ্যক যাত্রী ও যানবাহনের চাপ সামাল দিতে মেট্রোরেলের মতো গণপরিবহনই হতে পারে একটি কার্যকর বিকল্প ব্যবস্থা। তাই ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও যানজট নিরসনে মেট্রোরেল ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

মেট্রোরেল কী : মেট্রোপলিটন রেল-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো মেট্রোরেল। মহানগরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো স্পর্শ করে গণপরিবহনের জন্য প্রতিষ্ঠিত রেলব্যবস্থাই মেট্রোরেল। এটি একটি বিদ্যুৎচালিত পরিবহন। ঢাকা মেট্রোরেল ব্যবস্থার প্রকল্পটির নাম 'ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট'। এটি একটি দ্রুতগামী, স্বাচ্ছ্যন্দময়, সুবিধাজনক ও নিরাপদ নগরকেন্দ্রিক রেলব্যবস্থা।

মেট্রোরেলের গুরুত্ব : জনবহুল রাজধানী শহর ঢাকা যানজটের শহর হিসেবেই বিশেষভাবে পরিচিত। এই শহরে সকাল-দুপুর-বিকেল-রাত সবসময়ই যানজট লেগে থাকে। এখানে বাস, ট্রাক, কার, অটোরিকশা, বাইক আর রিকশা মিলিয়ে কয়েক লাখ যান প্রতিদিন চলাচল করে। দু-তিন ঘন্টা আগে রওয়ানা হয়েও সঠিক সময়ে কখনো গন্তব্যে

পৌছানো যায় না। রাস্তায় যানজটে রীতিমতো নাকানি-চুবানি খেতে হয় যাত্রীদের। ইতোমধ্যে সরকার বেশ কয়েকটি উড়াল সেতু, ওভারব্রিজ, আন্ডারপাস, লিংকরোড ইত্যাদি নির্মাণ করেছে। কিন্তু যানজট খুব একটা নিরসন হয়নি। এ কারণে যাত্রীদের সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বাসের অপেক্ষায়। সিএনজি বা রিকশাচালকদের হাতেও জিম্মি হতে হয় কখনো কখনো। ঝড়, বৃষ্টি বা হরতালের সময় মানুষের দুর্ভোগের সীমা থাকে না। এমতাবস্থায় মেট্রোরেল চালু

হলে সময়ের অপচয় যেমন হ্রাস পাবে তেমনই নির্ধারিত সময়ে গন্তব্যে পৌছানো সহজ হয়ে যাবে।

মেট্রোরেলের সুযোগ-সুবিধা: সাধারণ ট্রেন সার্ভিসের চেয়ে

মেট্রোরেলের ট্রেনে অধিকতর আধুনিক সুযোগ-সুবিধা থাকবে। এগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. উড়াল সড়ক: মূল সড়কের মাঝ বরাবর উড়াল সড়ক নির্মিত হবে। উড়াল সড়কের উপর স্থাপিত রেললাইনের উপর দিয়ে চলবে ট্রেন। যানজট যাতে না হয়, সেভাবেই উড়াল সড়ক তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে।

২. মেট্রোরেলের দৈর্ঘ্য: রাজধানীর উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেলের দৈর্ঘ্য হবে ২০ দশমিক ০১ কিলোমিটার। এই দীর্ঘ রুটে ১৬টি স্টেশন থাকবে। এগুলোর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত থাকবে ৯টি স্টেশন। এগুলো হচ্ছে উত্তরা নর্থ, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা সাউথ, পল্লবী, মিরপুর সাড়ে ১১ নম্বর, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া এবং আগারগাঁও। দ্বিতীয় পর্যায়ে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত থাকবে, ৭টি স্টেশন। এগুলো হচ্ছে বিজয় সরণি, ফার্মগেট, কারওয়ানবাজার, শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (টিএসসি), বাংলাদেশ সচিবালয় এবং মতিঝিল শাপলা চত্বর।

৩. বগি ও কামরা: প্রতিটি ট্রেনে ৬টি করে বগি থাকবে। প্রতিটি কামরা হবে সুপরিসর। সেখানে যাত্রীদের জন্য থাকবে আরামদায়ক আসন। এছাড়া প্রতিটি কামরা হবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।

৪. ট্রেন সংখ্যা ও সময়: উত্তরা-মতিঝিল রুটে চলাচল করবে ১৪টি ট্রেন। প্রতিটি ট্রেনে ৯৪২ জন যাত্রী বসে এবং ৭৫৪ জন যাত্রী দাঁড়িয়ে যাতায়াত করতে পারবে। প্রতি ০৪ মিনিট পর পর ট্রেন ছেড়ে যাবে। ট্রেনের গতি হবে ঘণ্টায় ৩২ কিলোমিটার। শেষ গন্তব্যে পৌছতে ট্রেনের সময় লাগবে ৩৮ মিনিট। প্রতি স্টেশনে ট্রেন অবস্থান করবে ৪০ সেকেন্ড।

৫. যাত্রী বহন ক্ষমতা ও ভাড়া আদায়: মেট্রোরেলে ২৪টি ট্রেন প্রতি ঘন্টায় আপ ও ডাউন রুটে দুই প্রান্তের ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহন ও করতে সক্ষম হবে। মেট্রোরেল ব্যবস্থায় যাত্রীদের সুবিধার্থে স্টেশনে প্রবেশের সময় মেশিনে ভাড়া সংগ্রহ করা হবে। স্বয়ংক্রিয় কার্ডের মাধ্যমে ভাড়া পরিশোধ করবেন যাত্রীরা।

প্রকল্পের ঋণচুক্তি: মেট্রোরেল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জাপান সরকারের দাতা সংস্থা জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা জাইকার সঙ্গে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সরকারের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর আগে অর্থাৎ ২০১২ সালের ১৮ ডিসেম্বর সরকারের অগ্রাধিকারমূলক মেট্রোরেল প্রকল্প জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে অনুমোদন লাভ করে।

প্রকল্প ব্যয় ও অর্থায়ন: পুরো ২০ দশমিক ০১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের মেট্রোরেল বাস্তবায়নে মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল ২১ হাজার ৯৮৫ কোটি ৫৯ লাখ টাকা। এর মধ্যে জাইকা প্রকল্পের ৮৫ শতাংশের ব্যয় বাবদ ১৬ হাজার ৫৯৪ কোটি ৪৮ লাখ টাকা দেবে কয়েক ধাপে। বাকি ৫ হাজার ৪ কোটি টাকা সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় করা হবে।

মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত মেট্রোরেল প্রকল্পের দৈর্ঘ্য ১.১৬ কি.মি. বাড়ানোর কারণে প্রকল্প ব্যয় ১১ হাজার ৪৮৬ কোটি ৯২ লাখ টাকা বৃদ্ধি হয়েছে। ফলে মোট ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৩৩ হাজার ৪৭১ কোটি ৯৯ লাখ টাকা।

মেট্রোরেল প্রকল্প উদ্বোধন: রাজধানীবাসীর বহুল প্রতীক্ষিত স্বপ্নের মেট্রোরেল প্রকল্পের নির্মাণকাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রথম মেট্রোরেল প্রকল্পের নির্মাণকাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ২৬ জুন, ২০১৬ সালে। প্রথম পর্যায়ে উত্তরা থেকে আগারগাঁও ১২ কিলোমিটার পর্যন্ত নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০২ আগস্ট, ২০১৭ সালে।

নির্মাণকাজের অগ্রগতি: প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ৩১ জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেলের নির্মাণ কাজের সার্বিক অগ্রগতি হয়েছে ৬৮.৪৯ শতাংশ। উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১২ কিলোমিটার লাইনের অগ্রগতি ৯২.৪৯ শতাংশ। ২০.১০ কিলোমিটার ভায়াডাক্টের মধ্যে ১৬.৫৬৬ কিলোমিটার ভায়াডাক্টের ইরেকশন শেষ হয়েছে। ১৭টি মেট্রো রেলস্টেশনের নির্মাণকাজ চলছে। দিয়াবাড়িতে ডিপোর ভেতরে রেলপথ স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। একই সঙ্গে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ভায়াডাক্টের ওপরে মূল রেলপথে ১৫ দশমিক ৫০ কিলোমিটার রেলপথ স্থাপন করা হয়েছে। ১৫ কিলোমিটার বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে দুই সেটের মোট ১২টি কোচ ঢাকার উত্তরার ডিপোতে এসে পৌঁছেছে। এগুলোর ১৯ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ট্রেন চালানো হবে বিদ্যুতের মাধ্যমে। পরীক্ষামূলকভাবে ২৯ আগস্ট ২০২১ দিয়াবাড়ি থেকে মিরপুর ১২ নম্বর স্টেশন পর্যন্ত ভায়াডাক্টের ওপর দিয়ে প্রথমবারের মতো মেট্রোরেল চালিয়ে দেখানো হয়। আর আগারগাঁও থেকে উত্তরা পর্যন্ত অংশের কাজ ৮০ শতাংশ শেষ হয়েছে।

২০২৪ সালের মধ্যে পুরো প্রকল্পের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত এবং ২০২৩ সালের মধ্যে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত শেষ করার লক্ষমাত্রা নিয়ে দ্রুত কাজ এগিয়ে চলছে।

গতিশীল অর্থনীতি ও সহজ যাতায়াত: বিপুল জনসংখ্যার রাজধানী শহরে যানজট নিরসনে কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা তথা স্ট্রাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান নিয়েছে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)। ডিটিসিএ-এর তত্ত্বাবধানেই বাংলাদেশ সরকার ও জাইকার অর্থায়নে মেট্রোরেল প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। যথাসময়ে প্রকল্পের সমাপ্তিতে যাত্রী পরিবহন শুরু হলে মেট্রোরেল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। সরকার এ প্রকল্প থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারবে এবং জিডিপি বৃদ্ধি পাবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এ অভিমত বাস্তবসম্মত ও তাৎপর্যপূর্ণ। তাছাড়া মেট্রোরেলের স্বস্তিদায়ক সেবার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরাপদে চলাফেরা করতে পারবে। বিশেষ করে বৃদ্ধ, শিশু, প্রতিবন্ধী ও নারীরা দুর্বিষহ কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে। উল্লেখ্য যে, যাত্রীরা নির্ধারিত স্থান থেকে ওঠানামা করার ফলে গড়ে উঠবে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর ঢাকা মহানগরী।

উপসংহার: সময়, অর্থ ও কাজের অপচয় যেন আমাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে। অথচ জাতি হিসেবে আমরা স্বাধীনতার ৪৮টি বছর অতিক্রম করছি। এখন দুর্দান্ত সময় এসেছে সমস্ত অপচয় রোধ করে এবং তা সঠিক পরিকল্পনামাফিক কার্যকর করে উন্নয়নের গতিশীলতাকে ফলপ্রসূ ও সফল করে তোলা। কারণ আমরা এখন উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছি। এর জন্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে যথার্থ উন্নয়নের পথে রয়েছি আমরা। যানজট নিরসনে বড় সড়কগুলো ৪ লেন ও ৬ লেনে উন্নীত করা হচ্ছে।

রাজধানীর যানজট নিরসনে নেওয়া হয়েছে মেট্রোরেলের মতো মেগা প্রকল্প যা দ্রুত দৃশ্যমান হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ সালে মেট্রোরেলের তিনটি পর্যায় চালু হলে রাজধানীর মানুষের সময়, অর্থ আর কাজের অপচয় বন্ধ হবে। মানুষ সময় ও অর্থ বাঁচিয়ে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে পাবে অপার আনন্দ ও স্বস্তি।

২৩. করোনা ভাইরাস

ভূমিকা: পৃথিবীতে কালে কালে বহুবার বহু নতুন কিছুর আবির্ভাব ঘটেছে, এখনও ঘটছে। সেসব বস্তু ইতিবাচক বা শুভ হলে পৃথিবী ও পৃথিবীর মানুষের জন্য কল্যাণকর হয়েছে। আবার অশুভ হলে তা ভয়ানক ক্ষতি ডেকে এনেছে। এ পৃথিবীতে বহুবার নানা রকম রোগ মহামারী আকার নিয়েছে, অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলকে শশ্মশানে পরিণত করেছে। বর্তমানে এমনই একটি ভয়াবহ রোগের ভাইরাস সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে লক্ষ লক্ষ প্রাণ কেড়ে নিয়েছে এবং এখনও নিচ্ছে, যার নাম করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯।

করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯ কী করোনা ভাইরাস এমন একটি সংক্রামক ভাইরাস যা এর আগে মানুষের মধ্যে ছড়ায়নি। এই ভাইরাসে বিশ্বব্যাপী প্রায় চার লাখ মানুষের প্রাণহানি হয়েছে, আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৬২ লাখ। করোনা ভাইরাস নামটির উৎপত্তি লাতিন শব্দ করোনা থেকে যার অর্থ 'মুকুট' বা 'হার'। ভাইরাসের উপরিভাগ প্রোটিনসমৃদ্ধ থাকে। এই প্রোটিন সংক্রমিত হওয়া টিস্যু বিনষ্ট করে। এই ভাইরাসের আরেক নাম নভেল করোনা ভাইরাস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটির আনুষ্ঠানিক নাম দিয়েছে 'কোভিড-১৯'।

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব: অনেক সময় কোনো একটি প্রাণী থেকে ভাইরাস এসে মানব শরীরে বাসা বাঁধতে শুরু করে। সাম্প্রতিক ভয়াবহ ভাইরাসটির উৎস কোনো প্রাণী বলেই মনে করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। মানুষের এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে চীনের উহান শহরে। সামুদ্রিক মাছ বিক্রির পাইকারি বাজারে। করোনা পরিবারে ছয়টি ভাইরাস আগে পরিচিত থাকলেও এখন যে ভাইরাসটিতে মানুষ সংক্রামিত হচ্ছে তা নতুন। এই নতুন ভাইরাসটির সংক্রমণ বিশ্বব্যাপী মারাত্মক রূপ নেওয়ায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটিকে বিশ্ব মহামারী ঘোষণা করেছে।

করোনা রোগের লক্ষণসমূহ: রেসপিরেটরি লক্ষণ ছাড়াও জ্বর, সর্দি, কাশি, শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যাই করোনা রোগের প্রধান লক্ষণ। সাধারণ শুষ্ক কাশি ও জ্বরের মাধ্যমেই শুরু হয় এ ভাইরাসের আক্রমণের উপসর্গ। অল্প সময়ের মধ্যেই এটি ফুসফুসে আক্রমণ করে। ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা দেখা দেয়। হাঁচি বা কাশির মাধ্যমেই এ রোগ ছড়ায়। সাধারণত রোগের লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে গড়ে পাঁচ দিন সময় লাগে।

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রাথমিক লক্ষণগুলো হলো:

- জ্বর
- অবসাদ
- শুষ্ক কাশি
- বমি হওয়া
- শ্বাসকষ্ট
- গলাব্যথা
- অঙ্গ বিকল হওয়া
- মাথাব্যথা

■ পেটের সমস্যা

বিশ্বজুড়ে এটির ভয়াবহ প্রভাব: বিশ্বজুড়ে এ পর্যন্ত প্রায় ৫৭ কোটির বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এবং ৬৪ লাখের বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। করোনার ছোবলে সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ৯ কোটি এবং মৃত্যুবরণ করেছে ১০ লাখের অধিক। ব্রাজিলে আক্রান্ত হয়েছে ৩.৪ কোটির অধিক এবং মৃত্যুবরণ করেছে প্রায় ৭ লাখ। ভারতে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ৪.৪ কোটি এবং মৃত্যুবরণ করেছে প্রায় ৭ লাখ। মেক্সিকোতে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ৬.৫ কোটি এবং মৃত্যুবরণ করেছে ৩ লাখের অধিক মানুষ। বাংলাদেশে আক্রান্ত হয়েছে ২০ লাখের অধিক এবং মৃত্যুবরণ করেছে প্রায় ৩০ হাজার।

বাংলাদেশে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ: বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়েছে। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে এদেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছেন।

নিচে এগুলো উল্লেখ করা হলো-

১. করোনা সংক্রমণের প্রথম দিকে সরকার সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করলেও পরবর্তীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বল্প পরিসরে সব প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

২. করোনা সংক্রমণের প্রথম দিকে গণপরিবহন বন্ধ ঘোষণা করা হলেও পরবর্তীতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বল্পসংখ্যক যাত্রী পরিবহনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

৩. প্রথম দিকে কেবল ওষুধের দোকান ও জরুরি প্রয়োজনীয় নিত্যপণ্যের দোকান খোলা থাকলেও পরবর্তীতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বল্পপরিসরে সর ধরনের দোকানপাট ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

৪. জনসাধারণ যাতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সর্বক্ষণ তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন।

৫. সরকার করোনার কারণে কর্মহীন শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের খাদ্য সহায়তা ও অর্থ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছেন।

৬. রাজধানীসহ সারা দেশে করোনার পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য পরীক্ষাগারসহ হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৭. করোনা পরীক্ষার টেকনিশিয়ানসহ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৮. পরীক্ষাগার ও হাসপাতালগুলোতে করোনা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও চিকিৎসাসামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে।

৯. ইংল্যান্ড ব্যতীত ইউরোপ থেকে যাত্রী আগমনে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয়েছে এবং বিমান চলাচলও স্থগিত করা হয়েছে।

১০. বিদেশফেরত যাত্রীসহ দেশের ভেতরে সন্দেহভাজন লোকদের হোমকোয়ারেন্টাইন ও আইসোলেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের উপায়: করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে এখন পর্যন্ত রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো অন্যদের মধ্যে ভাইরাসের সংক্রমণ হতে না দেওয়া। এর জন্য সতর্ক অবস্থানে থাকতে এবং কার্যকর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। বিশেষ করে-

- বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া এবং হাত ধুতে সবাইকে উৎসাহিত করা।
- ফেস মাস্ক (মুখোশ) ব্যবহার করা।
- ঘরে থাকা, জনসমাগম এড়িয়ে চলা তথা অন্যজন থেকে তিন ফুট দূরত্ব বজায় রাখা।

ভ্যাকসিন আবিষ্কার ও প্রয়োগ: বিশ্বব্যাপী মহামারী আকারে দ্রুত সংক্রমিত হওয়া করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তা কার্যকরভাবে প্রয়োগও শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত দশটি প্রতিষ্ঠানের আবিষ্কৃত ভ্যাকসিন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রয়োগের ক্রমানুসারে এগুলো হচ্ছে- অক্সফোর্ড, অ্যাস্ট্রাজেনেকা, ফাইজার, বায়োনটেক, মর্ডানা, সিনোফার্ম, স্পটনিক ডি, সিনোভ্যাক, জ্যানসেন, ইপিআইভ্যাক-করোনা, কোভ্যাকসিন (ভারত বায়োটেক)। এর বাইরেও আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের টিকা উৎপাদন ও প্রয়োগের পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর ৭৭০ কোটি মানুষকে কার্যকরভাবে টিকা দিতে যে পরিমাণ ভ্যাকসিন উৎপাদন প্রয়োজন তা বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ। তারপরও বিশ্বে ৮০০ কোটির বেশি ডোজ টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে চীনে প্রয়োগ করা হয়েছে ২০০ কোটি ডোজেরও বেশি এবং ভারতে ১০০ কোটি ডোজেরও বেশি।

বাংলাদেশে টিকা কার্যক্রম: টিকা পাওয়ার পরপরই বাংলাদেশে টিকা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। অক্সফোর্ডের অ্যাস্ট্রাজেনেকা, যুক্তরাষ্ট্রের ফাইজার ও মর্ডানা এবং চীনের তৈরি সিনোফার্মের ১০ কোটি ডোজেরও বেশি টিকা বাংলাদেশে প্রয়োগ করা হয়েছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রথমে জরুরি সেবাদানকারী ব্যক্তিবর্গ, তারপর পর্যায়ক্রমে বেশি বয়সী ও নানা শ্রেণি-পেশার মানুষকে টিকা প্রদান করা হয়েছে। এরপর স্কুল-কলেজ খুলে দেওয়ার প্রয়োজনে প্রথমে শিক্ষক-কর্মচারী এবং পরে শিক্ষার্থীদের টিকার আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে ১২ বছরের বেশি বয়সী শিক্ষার্থীদের টিকা প্রদান করা হচ্ছে।

উপসংহার: বিশ্বব্যাপী মারাত্মক আতঙ্ক ছড়ানোর নাম করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯। আতঙ্কের কারণ, এই অদৃশ্য ভাইরাসটি হাঁচি-কাশির মাধ্যমে দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং মারাত্মক সংক্রমণের মাধ্যমে মানুষের মৃত্যু ঘটায়। রূপ পরিবর্তনের কারণে এই ভাইরাস দিন দিন বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রাণঘাতী এই ভাইরাস সহসা নির্মূল হবে না। পৃথিবীর মানুষ কবে ভয়ঙ্কর এই ভাইরাসের আতঙ্ক থেকে, সংক্রমণের ঝুঁকি থেকে এবং মৃতের মিছিল থেকে রেহাই পাবে তার জবাবের জন্য ভবিষ্যতের দিকে তাকানো ছাড়া উপায় নেই।

২৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল

ভূমিকা: বাংলাদেশের মানুষ স্বপ্ন দেখে নতুন সম্ভাবনার, নতুন দিগন্ত উন্মোচনের, ব্যাপক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির। একসময় এদেশের মানুষকে বলা হতো ভাবপ্রবণ জাতি, ভিতু ও ভেতো বাঙালি। প্রকৃতপক্ষে তারা যে সাহসী ও সংগ্রামী, পরিশ্রমী ও ত্যাগী এবং স্বপ্নদ্রষ্টা ও বাস্তবায়নকারী তা এখন সারা পৃথিবীর মানুষের অজানা নয়। তারা সুস্পষ্টভাবে জানে, বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল।

বাংলাদেশে এখন একের পর এক মেগা উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলছে। এই ধারায় যুক্ত হয়েছে আর একটি মেগা প্রকল্প- 'বক্তাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল' বা 'কর্ণফুলী টানেল',

যা বাংলাদেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় সূচনা করবে বৈপ্লবিক পরিবর্তনদের

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল বা কর্ণফুলী টানেল: কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে চার লেন বিশিষ্ট যে অত্যাধুনিক সুড়ঙ্গ পথটি নির্মিত হচ্ছে সেটির নাম দেওয়া হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল বা কর্ণফুলী টানেল। এটি চট্টগ্রাম শহরের পতেঙ্গা নেভাল একাডেমি সংলগ্ন এলাকায় কর্ণফুলী নদীর মোহনার পাশ ঘেঁষে নিচ দিয়ে নির্মাণাধীন রয়েছে । এটি বাংলাদেশের নির্মিত প্রথম টানেল বা সুড়ঙ্গ পথ।

টানেল নির্মাণের উপযোগিতা: বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নদী কর্ণফুলী। এটি বাণিজ্যিক নগরী চট্টগ্রামকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছো এ নদীর উপর ইতোমধ্যে তিনটি সেতু নির্মিত হলেও অতি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অঞ্চলের জন্য তা যথেষ্ট নয়। তাছাড়া এ নদীর উপর সেতু নির্মাণের ফলে তলদেশে পলি জমে সমস্যা তৈরি করছে যা চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য বড় হুমকি। এ কারণেই কর্ণফুলী নদীর উপর নতুন সেতু নির্মাণ না করে নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের উদ্যোগ বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

টানেল নির্মাণের স্বপ্ন: 'প্রায় তের বছর আগে চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানের একটি জনসভায় চট্টগ্রামবাসীকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করার জন্য ২০১৪ সালের ১০ জুন প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বেইজিংয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সেই অনুযায়ী ২০১৬ সালের ১৪ অক্টোবর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং এ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এরপর ২০১৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় টানেল প্রকল্প এলাকার কনস্ট্রাকসন ইয়ার্ডে সুইচ টিপে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল বা কর্ণফুলী টানেল নির্মাণের খননকাজ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

অর্থায়ন: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল প্রকল্পটি বাংলাদেশ ও চীন সরকারের যৌথ অর্থায়নে সেতু কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পটির মোট ব্যয় হবে ১০ হাজার ৩৭৪ কোটি ৪২ লাখ টাকা। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকার দিচ্ছে ৪ হাজার ৪৬১ কোটি ২৩ লাখ টাকা আর চুক্তি অনুযায়ী চীনের এক্সিম ব্যাংক ২০ বছর মেয়াদি ঋণ হিসেবে দিচ্ছে ৫ হাজার ৯১৩ কোটি ১৯ লাখ টাকা।

নির্মাণ তথ্য: চার লেন বিশিষ্ট দুটি টিউব সংবলিত মূল টানেলের

দৈর্ঘ্য ৩.৪৩ কিলোমিটার। নদীর তলদেশে প্রতিটি টিউবের চওড়া ১০.৮ মিটার বা ৩৫ ফুট এবং উচ্চতা ৪.৮ মিটার বা ১৬ ফুট। একটি টিউব থেকে আর একটি টিউবের পাশাপাশি দূরত্ব ১২ মিটার। টানেলের প্রস্থ ৭০০ মিটার এবং দৈর্ঘ্য ৩ হাজার ৪০০ মিটার। এছাড়া টানেলের পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্তে ৫.৩৫ কিলোমিটার অ্যাপ্রোচ রোড এবং ৭২৭ মিটার ওভারব্রিজ থাকবে, যা চট্টগ্রাম শহরের সঙ্গে আনোয়ারা উপজেলাকে সংযুক্ত করবে।

টানেলের নকশা ও উপকরণ ব্যবহার: সব ধরনের চ্যালেঞ্জের বিষয়গুলো বিশেষভাবে বিবেচনা করেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের নকশা ও উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। এ প্রকল্পের প্রধান সরঞ্জামই হলো শিল্ড মেশিন, যা সম্পূর্ণ চীনা প্রযুক্তি ও উপকরণ ব্যবহার করেই কেবল এই টানেলের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। বিশেষায়িত যন্ত্র দিয়েই তৈরি হচ্ছে এই টানেল। নদীর পানি বা অন্য কোনো তরল পদার্থ যাতে টানেলে প্রবেশ করতে না পারে, সেজন্য প্রতিটি সেগমেন্ট নির্মাণ করা হচ্ছে অ্যান্টিসিপেস ম্যাটেরিয়াল দিয়ে। ভেতরে বাতাস প্রবেশের জন্য থাকছে ২০টি শক্তিশালী পাখা। থাকবে পর্যাপ্ত আলো সরবরাহের ব্যবস্থা।

তাছাড়া টানেলের নিচে পাম্পঘর রাখা হয়েছে, যাতে টানেলে পানি বা কোনো তরল পদার্থ ঢুকলে তা পাম্প করে বের করা যায়।

নির্মাণকাজের অগ্রগতি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৮৬ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গা প্রান্ত থেকে কর্ণফুলী নদীর তলদেশ হয়ে নদীর ওপাড়ে আনোয়ারা পর্যন্ত একটি টিউব পরিপূর্ণভাবে স্থাপন করা হয়েছে। এখন এটির ইন্টারনাল স্ট্রাকচার নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ল্যান্ড স্লাব ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অন্যদিকে দ্বিতীয় টিউব স্থাপনের কাজও প্রায় শেষের দিকে। দ্বিতীয় টিউবের ১৯৬৮ মিটার অর্থাৎ ৮০.৫৯ শতাংশ বোরিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। টানেলের সবকটি অর্থাৎ ১৯,৬১৬টি সেগজুলাইন্টের নির্মাণ ও রিজেক্টেড সেগজুলাইন্টের সমপরিমাণ সেগজুলাইন্টের পুনর্নির্মাণ কাজও সম্পন্ন হয়েছে।

অন্যদিকে আনোয়ারা প্রান্তের ৭২৭ মিটার ভায়াডাক্টের গার্ড রেল ও ওয়েস্ট জয়েন্ট কনস্ট্রাকশনের কাজ চলমান রয়েছে। টানেলের পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্তে মোট ৫.৩৫ কিলোমিটার অ্যাপ্রোচ সড়কের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের অধিগ্রহণ ও রিকুইজিশনযোগ্য মোট ৩৮৩ একর ভূমির মধ্যে ৩৬২.৩২ একর ভূমি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ১৯.৭৬ একর ভূমি হস্তান্তরের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এছাড়া টানেল প্রকল্পের ম্যানেজজুলাইন্ট সফটওয়্যারের কাজ প্রায় শেষ। হার্ডওয়্যার স্থাপন ও বিবিএ বিল্ডিং নেটওয়ার্কের কাজ পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছে।

করোনায় কর্মীর সংখ্যা হ্রাস পেলেও এখন বেশিরভাগ বাংলাদেশি এবং ৩০০ চীনা কর্মী ও প্রকৌশলী মিলে ১,০০০ কর্মী দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছে।

নির্মাণপরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হ্যান্ডবুক তৈরি করা হয়েছে। দেশীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে যাতে নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু করতে পারেন। ২০২২ সালের শেষ দিকে এটি চালু করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের ব্যবহারিক দিক: প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডির প্রতিবেদন অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল চালুর প্রথম বছরে ৬৩ লাখ গাড়ি চলাচল করতে পারবে। সেটি ক্রমান্বয়ে বেড়ে দেড় কোটিতে পৌছাবে। প্রথম বছরে চলাচলকারী গাড়ির প্রায় ৫১ শতাংশ হবে কনটেইনার পরিবহনকারী ট্রেইলর ও বিভিন্ন ধরনের ট্রাক ও ভ্যান। বাকি ৪৯ শতাংশের মধ্যে ১৩ লাখ বাস ও মিনিবাস এবং ১২ লাখ কার, জিপ ও বিভিন্ন ছোট গাড়ি চলাচল করবে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব: কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে দেশের প্রথম টানেল হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। এটি শুধু দেশের দক্ষিণ- পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলবে না, এটির মাধ্যমে দক্ষিণ চট্টগ্রামের শিল্প-কারখানাসহ অর্থনৈতিক বিপ্লব সাধিত হবে।

১. টানেল চালু হলে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের মধ্যে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে এবং এশিয়ান হাইওয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

২. কর্ণফুলী নদীর পূর্ব প্রান্তের প্রস্তাবিত শিল্প এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এবং পশ্চিম প্রান্তের চট্টগ্রাম শহর, সমুদ্রবন্দর ও বিমানবন্দরের সঙ্গে উন্নত ও সহজ যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

ফলে ভ্রমণ সময় ও খরচ হ্রাস পাবে। পূর্ব প্রান্তের শিল্প-কারখানার কাঁচামাল ও প্রস্তুতকৃত মালামাল চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর ও দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পরিবহন করা সহজ হবে।

৩. মহেশখালী-মাতারবাড়ি এলাকায় দেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর, কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, এলএনজি স্টেশনসহ জ্বালানিভিত্তিক বিপুলসংখ্যক দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে শিল্প- কারখানা নির্মাণের কাজ চলছে, এ টানেল সেগুলোর সঙ্গে পুরো বাংলাদেশের যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করবে।

৪. আনোয়ারা এলাকার নির্মাণাধীন চায়না অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং গড়ে ওঠা কোরিয়ান ইপিজেডসহ অন্যান্য শিল্প-কারখানার সঙ্গে সুবিধাজনক যোগাযোগে এই টানেল ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

৫. পর্যটন এলাকাগুলোর মধ্যে কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, বান্দরবানসহ পাহাড়, সমদ্র ও নদীর এ ত্রিমাত্রিক নয়নাভিরাম সৌন্দর্য উপভোগ করতে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের সহজতর যোগাযোগ ব্যবস্থায় এ টানেল মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

৬. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল নির্মাণের ফলে বেকারত্ব দূরীকরণ ও দারিদ্র্যদূরীকরণসহ দেশের ব্যাপক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

৭. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল নির্মাণের ফলে চীনের সাংহাই শহরের মতো চট্টগ্রাম শহরকে 'ওয়ান সিটি টু টাউন' মডেলে গড়ে তোলা হবে।

জিডিপিতে ইতিবাচক প্রভাব: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল নির্মাণের ফলে ফিন্যান্সিয়াল ও ইকোনোমিক আইআরআর-এর পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ৬ দশমিক ১৯ শতাংশ এবং ১২ দশমিক ৪৯ শতাংশ। এছাড়া বেনিফিট কস্ট রেশিওর পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ১ দশমিক ০৫ এবং ১ দশমিক ৫। ফলে জিডিপিতে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, অর্থাৎ জিডিপি শূন্য দশমিক ১৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

উপসংহার: কারিগরি ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডই থেমে থাকে না। দেশ ও মানুষের মহত্তম কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে এবং উন্নয়ন কর্মকে নিখুঁত, কার্যকর ও দীর্ঘস্থায়ী করতে বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষকে কাজে লাগাতে হবে। বর্তমান সরকার ইচ্ছে ও উপায়কে সমন্বিত করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল' বা 'কর্ণফুলী টানেল' নির্মাণ তারই একটি সাফল্য-সোপান। আমাদের সবাইকে দেশ ও জাতির কথা ভাবতে হবে, ইচ্ছে ও উপায়কে সমন্বিত করে কারিগরি ও প্রযুক্তির উৎকর্ষকে কাজে লাগিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে হবে।

২৫. বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প

[ঢা. বো. '১৫, '১৪, '০৯; রা. বো. '১৫; য. বো, '১০, '০২; কু. বো, '০৮, '০৬, '০৪; চ. বো. '১৬, '১১, '০৬, '০৩; সি. বো, '১৩, '১০, '০৬; ব. বো. '১৬, '১৫, '১৩, '১১; দি. বো, '১০, '১৫]

ভূমিকা: একবিংশ শতাব্দীতে পর্যটন শিল্প একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম উপাদানে পরিণত হয়েছে। মানুষ চিরকালই সুন্দরের পূজারি, কৌতূহলী এবং বৈচিত্র্যের প্রত্যাশী। অজানাকে জনার, অচেনাকে চেনার আকাঙ্ক্ষায় মানুষের মন সব সময় উন্মুখ। অজানাকে জানতে, সুন্দরকে অবলোকন করতে আবহমানকাল থেকে মানুষ ছুটে চলছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। মানুষের এ অদম্য উৎসাহ থেকেই পর্যটন শিল্পের জন্ম।

পর্যটন কী: অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার, অদেখাকে দেখার আকাঙ্ক্ষায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, এক দেশ থেকে আরেক দেশে ভ্রমণ করাকে পর্যটন বলা হয়। পর্যটন একাধারে একটি দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মকাণ্ড। AIEST (অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল অব এক্সপার্টস ইন সায়েন্টিফিক্ ট্যুরিজাম)-এর মতে, "কোনো উপার্জনমূলক কাজে যুক্ত নয় এবং স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে না এমন ব্যক্তির ভ্রমণ এবং কোথাও থাকা থেকে উৎসারিত প্রপঞ্চ ও সম্পর্কের সমষ্টি হচ্ছে পর্যটন।" বর্তমানে পর্যটন একটি শিল্প হিসেবে স্বীকৃত।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের আকর্ষণ: প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের এ দেশ। অপরিমেয় সৌন্দর্য ছড়িয়ে রয়েছে এ দেশের প্রতিটি আনাচে-কানাচে। প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, আত্মিক সকল সম্পদেই বাংলাদেশ সমৃদ্ধ। তাই যুগ যুগ ধরে বিদেশি পর্যটকদের কাছে বাংলাদেশ এক স্বপ্নের দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু এবং প্রাচীন সভ্যতার একটি কেন্দ্র হওয়ার কারণে যুগ যুগ ধরে অনেক পর্যটকের আগমন ঘটছে এদেশে। বাংলাদেশের সুন্দরবন, সোনারগাঁও, কক্সবাজার, কাপ্তাই, কুয়াকাটা, রাঙামাটি, ময়নামতি, পাহাড়পুর, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সাজেক ভেলি প্রভৃতি স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের মুগ্ধ করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করে বিভিন্ন আদিবাসী। যেমন- চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, গারো, মণিপুরি, খাসিয়া প্রভৃতি। তাদের পোশাক, জীবনযাত্রা ও বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি পর্যটকদের এদেশের প্রতি আকর্ষণ করতে অন্যতম ভূমিকা পালন করে।

জাতীয় পর্যটন নীতিমালা: ১৯৯২ সালে প্রথম পর্যটন সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালা ঘোষিত হয়। এই নীতিতে রর্ণিত দেশের পর্যটনের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

১. বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার আয় বাড়ানো।

২. জনসাধারণের মধ্যে পর্যটনের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি করা এবং তাদের জন্য অল্প খরচে পর্যটন সুবিধা সৃষ্টি করা।

৩. দেশের পর্যটন সম্পদের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং এর মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচন।

৪. বিদেশে বাংলাদেশ সম্পর্কে ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলা।

৫. বেসরকারি পুঁজির জন্য একটি স্বীকৃত বিনিয়োগের ক্ষেত্র উন্মোচন করা।

৬. বিদেশি পর্যটক এবং দেশীয় জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা।

৭. হস্ত ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন, দেশের ঐতিহ্যের লালন ও বিকাশের মাধ্যমে জাতীয় সংহতি ও ঐকমত্য সুদৃঢ় করা।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পর্যটন শিল্পের সুবিধা: পর্যটনকে বলা হয় 'Invisible Export Goods' বা অদৃশ্য রপ্তানি পণ্য। অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের তুলনায় পর্যটনের সুবিধা হলো এর আয় সীমিত নয়। কেননা এটি এমন এক শিল্প যেখানে বিনিয়োগ, চাকরি ও আয়ের কোনো সীমা নেই। বিশেষত আমাদের বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব যেখানে প্রধান সমস্যা, সেখানে স্বল্প পুঁজিতে পর্যটন শিল্পকে কাজে লাগাতে পারলে তা ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারবে। তবে এজন্য প্রয়োজন জাতির মানসিক গঠন ও সেবাদানের উপযুক্ত দক্ষ জনগোষ্ঠী।

পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য করণীয়: বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান ও সংকট উত্তরণ হঠাৎ করে করা সম্ভব নয়। তবে এর জন্য আমাদের এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে সেগুলো নিচে দেওয়া হলো :

১. পর্যটন সম্পর্কিত নীতিমালা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় সংস্থানসমূহের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে।